ইউনিট ৩
শিক্ষার্থীর ভাষায় পারদর্শিতা উন্নয়ন পদ্ধতি - ব্যাকরণ

অধিবেশন ১ : বাংলা ব্যাকরণঃ পদপ্রকরণ, সংজ্ঞার্থ ও শ্রেণীবিভাগ বিশ্লেষণ

অধিবেশন ২ : ব্যাকরণঃ প্রকৃতি-প্রত্যয়-সংজ্ঞা, প্রকৃতি, প্রত্যয় বিশ্লেষণ ও চিহ্নিতকরণ

অধিবেশন ৩ : সন্ধিঃ বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ ও বাংলা ভাষায় সন্ধির প্রয়োজনীয়তা

অধিবেশন ৪ : বাক্যতত্ত্ব : গঠন, অংশবিন্যাস, শ্রেণীবিভাগ ও বাক্য পরিবর্তন কৌশল

অধিবেশন ৫ : সাধু ও চলতি ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য : প্রমিত চলিতরীতির অনুশীলন

অধিবেশন ৬ : ব্যাকরণ বিশ্লেষণ : সমাস

অধিবেশন ৭ : অনুবাদ শিক্ষণ

অধিবেশন ৮ : ব্যাকরণ শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি এবং পদ্ধতির অনুশীলন

ইউনিট ৩ **অধিবেশন ১**

বাংলা ব্যাকরণ : পদ প্রকরণ, সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ বিশ্লেষণ

প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণে পদ ও পদ-সংশিষ্ট আলোচনা তথা বর্ণনা-ব্যাখ্যা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কিন্তু এ সংক্রান্ত শিক্ষাদান এবং প্রকৃত ব্যবহার-পারদর্শী অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হয় না। এর অন্যতম কারণ বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত এবং কিছুটা ল্যাটিন ব্যাকরণের (ইংরেজির মাধ্যমে) অনুকরণে বৃত্তাবদ্ধ। বাংলা ভাষা-পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে এই অংশের পাঠদানের অভাবে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়েরই অসুবিধা থেকে যায়। ভাষাবিজ্ঞানের ধারণা থেকে এটা উল্লেখ্য যে, শব্দের ব্যাকরণই আসলে প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণ- যেখানে গুরুত্ব পায় শব্দগঠনের বিধিবিধান, গৌণ হয়ে যায় বাক্য। <অথচ, আধুনিক ভাষা-বৈজ্ঞানিক বিচারে বাক্যই ব্যাকরণের ভিত্তি; বাক্য এবং অজস্র শুদ্ধ বাক্য উৎপাদনই ব্যাকরণের অন্তিম উদ্দেশ্য।>

অতএব, বাক্যের সামগ্রিকতা থেকেই 'পদ' তথা 'পদ প্রকরণ'কে দেখতে হবে।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- পদ কী তা ব্যাখ্যা করে সংজ্ঞা/সংজ্ঞার্থ গঠন করতে পারবেন।
- প্রত্যেক প্রকার পদের শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ, বিশ্লেষণ ও সংজ্ঞা/সংজ্ঞার্থ প্রদান করতে পারবেন।
- বাক্যের উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকার পদ চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পদ পাঠদান কৌশল আয়ত্ত করতে পারবেন।
- শুদ্ধ পদসংস্থাপন ও পরিবর্তন করে মাতৃভাষা চর্চায় পারগতা অর্জনে সক্ষম হবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : পদ ও পদ প্রকরণ

পদ প্রকরণ : ব্যাকরণের যে অংশ শব্দ ও শব্দের গঠন, শব্দের শ্রেণী বিভাগ, পদ, পদের পরিচয়, প্রত্যয়, বচন, শব্দরূপ কারক, সমাস, ক্রিয়া, ক্রিয়ার কাল, ভাব, শব্দের ও পদের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করে তাকে পদ প্রকরণ বলে।

পদের পরিচয় বা সংজ্ঞা : প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণ অনুসরণে বলা হয় যে, অর্থবোধক বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি দিয়ে গঠিত কোনো শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হলে তা-ই পদ। শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হলেই তাতে বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন - শিশুরা হাসে (শিশু + রা, হাস্ + এ)। লক্ষযোগ্য যে, এখানে

দুই রকমের ভাষাবস্তু বা উপাদান (শব্দ ও পদ) নির্দেশিত- যে দুয়ের পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে 'বাক্য'কে ভিত্তি করে। অর্থাৎ দেখানো হচ্ছে : শব্দ বাক্য-বিচ্ছিন্ন, আর পদ বাক্যে বিন্যস্ত ভাষাবস্তু।

বাংলা বাক্যের ব্যবহার উপযোগিতা বিচার করলে শব্দ ও পদের পার্থক্য নির্দেশ প্রয়োজনের চেয়ে বরং 'পদ' ধারণাটিকে অধিক বাস্তবসম্মত ও প্রয়োগপ্রবণ মনে হয়।

বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে পদ বা শব্দকে যে শ্রেণীকৃত করা যায় না, এরকম বিভাজনে তা বিবেচিত হয় না। কারণ, ভাষার যেসমস্ত শব্দ থাকে সেগুলো বাক্যের বিভিন্ন স্থানে/অংশে বসেই বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। তাই শব্দ/পদরাশিকে অর্থ ও বাক্যের স্থান অনুসারেই নানা শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা উচিত। এই বিবেচনায় এক বা একাধিক শব্দের গুচ্ছকেও 'পদ' অভিধা দেয়া সম্ভব। ড. মুহম্মদ শহীদুলাহ্‌র মতে-- ''বাক্যের প্রত্যেক অর্থবিশিষ্ট অংশকে পদ বলে"।

পদের শ্রেণী-উপশ্রেণীকরণের ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়টি যেমন জটিল-জালিকার মত হয়ে ওঠে তেমনি শিক্ষকের পক্ষেও ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পুরো ব্যাপারটি বোঝানো সহজ হয় না। বিশ শতকে বাংলা ব্যাকরণ রচয়িতাগণ সংস্কৃত অনুসরণে ৫ রকম পদ স্বীকার করেন (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া), কিন্তু পদের সংজ্ঞা ও বিবরণে তাঁরা ইংরেজি ব্যাকরণকেই অনুসরণ করেন। এই ৫ শ্রেণীর সংজ্ঞা (শুধু অব্যয়ের সংজ্ঞা বাদে) রচিত হয় ইংরেজি 'Parts of Speech'-এর সংজ্ঞার অনুসরণে। কালক্রমে বাংলায় প্রধান পাঁচ শ্রেণীর শব্দ/পদ স্বীকৃত হয়।

পদের প্রাথমিক পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয় যে, পদ প্রধানত ২ প্রকার : নামপদ ও ক্রিয়াপদ। বিভক্তিযুক্ত শব্দকে **নামপদ** এবং বিভক্তি যুক্ত ক্রিয়ার মূলকে **ক্রিয়াপদ** বলে। তবে, প্রথাগতভাবে পদের শ্রেণীবিভাগ করা হয় নিম্নোক্তভাবে :

পদের শ্রেণী বিভাগ ছক :

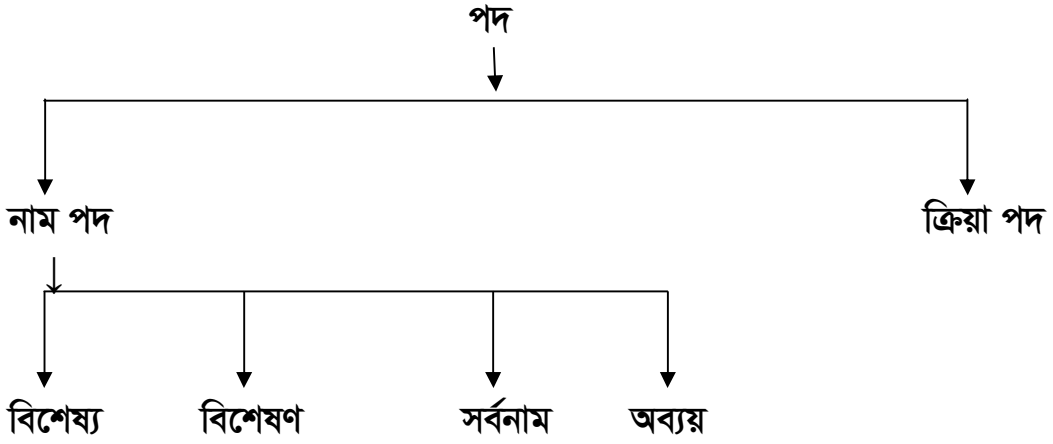

এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয়/বর্ণনা তথা সংজ্ঞার্থ ও উদাহরণ এই রকম :

১। বিশেষ্য : যে পদ দিয়ে কোন কিছুর নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য পদ বলে। যেমন- করিম, রহমান, ইত্যাদি।

বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার :

(১.) নাম বিশেষ্য : ব্যক্তির নাম যেমন- হযরত মোহাম্মদ (সাঃ), যীশু, মরিয়ম, গীতা।

(২.) বস্তুবাচক বিশেষ্য : বস্তু বা পদার্থ যেমন- চিনি, গুড়, লোহা, সোনা, পিতল।

(৩.) জাতিবাচক বিশেষ্য : একজাতীয় বস্তু, প্রাণী, একাধিক ও অনির্দিষ্ট নাম। যেমন- মানুষ, পশু, গাছ, নদী, পর্বত।

(৪.) সমষ্টিবাচক বিশেষ্য : একজাতীয় প্রাণী, বস্তু ও সমষ্টির নাম। যেমন- ঝাঁক, দল, পাল, গুচ্ছ।

(৫.) গুণবাচক বিশেষ্য : দোষ, গুণ, অবস্থার নাম, যেমন- দয়া, মহত্ত্ব, সততা, ধৈর্য।

(৬.) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য : ক্রিয়াবাচক পদের নাম। যেমন- শ্রবণ, দর্শন, কর্ষণ।

২। বিশেষণ : যে পদ দিয়ে অন্য পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, পরিমাণ ও সংখ্যা বোঝায় তাকে বিশেষণ পদ বলে। যেমন- লাল, দুঃখ, সুখ, হাজার।

বিশেষণ তিন প্রকার:

(১.) নাম বিশেষণ : (দুষ্ট ছেলে)

(২.) বিশেষণের বিশেষণ : (অত্যন্ত ভাল ছেলে)

(৩.) ক্রিয়া বিশেষণ : (ধীরে চল)

৩। সর্বনাম : যে পদ নামের পরিবর্তে বসে তাকে সর্বনাম পদ বলে। যেমন- নাসিমা ভাল মেয়ে।

সে নিয়মিত নামাজ পড়ে।

সর্বনাম পদকে এগার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ব্যক্তিবাচক, নির্দেশবাচক, অনিশ্চয়তাবাচক, আত্মবাচক, প্রশ্নসূচক, সংযোগবাচক, ব্যষ্টিবাচক, সমষ্টিবাচক, অনাদিবাচক, ব্যতিহারিক ও পারস্পরিক সঙ্গতিমূলক সর্বনাম।

৪। অব্যয় : যে পদ বাক্যে সর্বত্র অবিকৃত ও অপরিবর্তিত থাকে তাকে অব্যয় পদ বলে।

যেমন- অতএব, এটাই সিদ্ধান্ত হল। তুমি কি যাবে ?

অব্যয় প্রধানত চার প্রকার :

(১.) সমুচ্চয়ী বা সংযোগমূলক অব্যয়: (ও, কিংবা, কিন্তু, এবং)

(২.) অনন্বয়ী অব্যয়: (ওগো, ওরে, আঃ, মরিমরি)

(৩.) পদান্বয়ী অব্যয়: (বিনা, হতে, চেয়ে)

(৪.) অনুসর্গ অব্যয়ঃ (ঝমঝম,কুহুকুহু, গরগর)

৫। ক্রিয়াপদ : যে পদ দিয়ে কোন কিছু করা বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন- আলী পড়ছে। হওয়া, খাওয়া, থাকা, খা, এসবও ক্রিয়াপদ।

ক্রিয়াপদ দু প্রকারঃ

১. সমাপিকা ক্রিয়াঃ (আমরা দৌড়াব)।

২. অসমাপিকা ক্রিয়াঃ (পথে যেতে দেখা হলো)।

সমাপিকা ক্রিয়া দু প্রকার-

ক) সকর্মক ক্রিয়া - ওমর ভাত খায়।

খ) অকর্মক ক্রিয়া - আছিয়া যাচ্ছে।

কিন্তু প্রধান পদগুলোকে এমনভাবে উপশ্রেণীকরণ করা হয় যাতে পদের সংখ্যা বৃদ্ধিই পায়। যেমন -

বিশেষ্যের আরো শ্রেণী নির্দেশ করা যায় :

ভাববাচক, জাতিবাচক, বস্তুবাচক, সংখ্যা বা পরিমাণবাচক, সমষ্টিবাচক, অবস্থাবাচক, সামান্যবাচক বিশেষ্য ইত্যাদি।

বিশেষণের আরো শ্রেণী :

সাক্ষাৎ বিশেষণ, বিশেষ্যের বিশেষণ; অর্থানুযায়ী : কালবাচক, স্থানবাচক, প্রকৃতিবাচক; রূপগত ভাগঃ বিভক্তিযুক্ত, প্রত্যয়যুক্ত, দ্বিরুক্তি শব্দ; গঠন বিচারে : তদ্ধিত প্রত্যয়জাত, ক্রিয়াজাত, সর্বনামজাত, অব্যয়জাত ইত্যাদি।

সর্বনামের অনুশ্রেণীসমূহ :

সাকুল্যবাচক, প্রতিনির্দেশক ইত্যাদি।

অব্যয়কে নানানভাবে অনেকগুলো শ্রেণী-উপশ্রেণীতে দেখানো যেতে পারে :

এগুলো ছাড়া এক সমুন্বয়ী অব্যয় বা সমুচ্চয়ী অব্যয়কেই ১৭ রকমভাবে দেখানো যেতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রে এরকম 'শ্রেণীকরণ প্রবণতার উদাহরণ' নিরর্থক বা তাৎপর্যহীনও মনে হয়। শিক্ষার্থী সহজভাবে যতটুকু নিতে পারবে তার ওপরই শিক্ষকের যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।

এই পর্বে পদ ও পদপ্রকরণ সম্পর্কে আপনি আর কী-প্রকার চিন্তার কথা বলতে পারেন?

পর্ব-খ : বাক্যস্থিত পদসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়

পদপ্রকরণ তথা পদ সম্পর্কিত শিক্ষণের প্রকৃষ্ট পন্থার ক্ষেত্রে 'ব্যাকরণ পাঠদানের পদ্ধতির' মৌলিক নীতিকে বিবেচনায় নেয়া যায়। অধুনা ব্যাকরণের পাঠদানের উপযোগী পদ্ধতি যেখানে 'মনোবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি' তার সঙ্গে ব্যবহারিক কর্মের/অনুশীলনের সমন্বয় ঘটিয়ে শিক্ষাদান করলে সর্বাধিক ফললাভ সম্ভব। পদপ্রকরণের বিবেচনায় আরোহী পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে বাক্যস্থিত পদসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে অভ্যস্ত করতে হবে।

ক. পদ চিহ্নিতকরণ :

১. রুবেল একটি মোবাইল ফোন কিনেছে। এখানে ৫টি শব্দ, ৩টি পদ।
(১.১) রুবেল - নামবিশেষ্য, (১.২) একটি - সংখ্যাবাচক নির্দেশক বিশেষণ, মোবাইল - গুণবাচক বিশেষণ, ফোন - বস্তুবাচক বিশেষ্য, (১.৩) কিনেছে - ক্রিয়াপদ।

২. দিনের বেলা কাজের সময় কাজ করো। এখানে ৬টি শব্দ, ৪টি পদ।
(২.১) দিনের বেলা - কালবাচক বিশেষণ, (২.২) কাজের সময় - কর্মনির্দেশক বিশেষ্য, (২.৩) কাজ - বিশেষ্য, (২.৪) করো - নির্দেশক ক্রিয়া।

৩. এমন চমৎকার মানুষ হয় না। এখানে ৫টি শব্দ, ৫টি পদ।
(৩.১) এমন - বিশেষণের বিশেষণ, (৩.২) চমৎকার - বিশেষণ, (৩.৩) মানুষ - ব্যক্তি বাচক বিশেষ্য, (৩.৪) হয় - ক্রিয়া পদ, (৩.৫) না - নঞার্থক অব্যয় বা উপসর্গ।

খ. পদান্তর কৌশল :

বিশেষ্য থেকে বিশেষণ:

শ্রু + অনট = শ্রবণ - শ্রবণ করা।
ধার +আল = ধারাল - ধারাল ছুরি।
দরদ +ই = দরদি - দরদি বন্ধু

বিশেষণ থেকে বিশেষ্য:

দুর্বল +তা = দুর্বলতা - দুর্বলতা পরিহার।
চালাক + ই = চালাকি - চালাকি করা।
মিঠা + আই = মিঠাই - মজার মিঠাই।

বিশেষ্য থেকে বিশেষ্যঃ

সাহেব + আনা = সাহেবিয়ানা - সাহেবিয়ানা হাস্যকর।

মুটে + গিরি = মুটেগিরি - জীবিকার উপায় মুটেগিরি।

মিত্র + তা = মিত্রতা - মিত্রতা প্রশংসনীয়।

বিশেষণ থেকে বিশেষণ:

মহৎ + তর = মহত্তর - মহত্তর কর্ম।

বৃদ্ধ + ইষ্ঠ = জ্যেষ্ঠ - জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

প্রিয় + তম = প্রিয়তম - প্রিয়তম ব্যক্তি।

গ. পদ-পরিবর্তন কৌশলঃ

পদকে বিভিন্নভাবে পরিবর্তনের মাধ্যমে বাক্য গঠন করে ভাষাকে ভাব প্রকাশের অনুগামী করা হয়। যেমন-

১. বিশেষ্যের বিশেষণে পরিবর্তন, পশ্চিম > পশ্চিমা।
২. বিশেষণের বিশেষ্যে পরিবর্তন, সরল > সরলতা।
৩. সর্বনামের বিশেষ্যে পরিবর্তন, অহম > অহমিকা।
৪. সর্বনামের বিশেষণে পরিবর্তন, তদ্ > তদীয়।
৫. জাতিবাচক বিশেষ্যের গুণবাচক বিশেষ্যে পরিবর্তন, পশু > পশুত্ব

এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য যে, প্রত্যয়যুক্ত হয়ে পদের রূপান্তরই অধিক পরিলক্ষিত হয়।

ঘ. অবিন্যস্ত শব্দ/পদ ব্যবহৃত বাক্য

১. লেখ পদ কয়েকটি পরিবর্তনের নিয়ম শুদ্ধ। (পদ পরিবর্তনের কয়েকটি শুদ্ধ নিয়ম লেখ।)
২. দাও করে প্রত্যেক উদাহরণ তিনটি নিয়মের। (প্রত্যেক নিয়মের তিনটি করে উদাহরণ দাও।)
৩. রুটি ঝলসানো চাঁদ পূর্ণিমার যেন। (''পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি"।
৪. তিনি হলেন আসীন পদে শিক্ষকের প্রধান। (তিনি প্রধান শিক্ষকের পদে আসীন হলেন।)
৫. চরিত্র উন্নত নীতি বোধের মানুষের কারণে হয় গঠিত। (মানুষের নীতিবোধের কারণে উন্নত চরিত্র গঠিত হয়।)

ঙ. বিচ্ছিন্ন শব্দকে বাক্যে পদ রূপে সংস্থাপন করা :

১। ভারা রাশি হল (''রাশি রাশি ভারা ভারা/ ধান কাটা হল সারা")
রাশি কাটা ধান ভারা সারা

২। ঘরে আনন্দের ঘরে ('‘ঘরে ঘরে উঠল বেজে/ আনন্দের সুর")
উঠলবেজে সুর

৩। সাতনদীর ছিল সমুদ্র তের পারে রাজা এক
(সাত সমুদ্র তের নদীর পারে ছিল এক রাজা।)

চ. অবিন্যস্ত পদকে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে সাজিয়ে একটি শুদ্ধ তালিকা প্রস্তুত করা:

নবাব, নবাবী, সাহেব, চোরাই, নবাব, চোর, কাঠ, ঝাঁজ, তামাটে, গাঁ, কুনো, কোনা, দাঁত, কেজো, পাঁক, পাঁকাল, তামা, গেঁয়ো, নোনা, পশ্চিম, ও জ্ঞান, জগৎ, জীর্ণ, জটিল, ঘুমন্ত, গৃহ, আমন্ত্রিত, আহৃত, অধীত, হিমেল, সান্ধ্য, শারদীয়, লাভ, লয়, লজ্জা (উত্তর সঙ্কেত: বিশেষ্য-নবাব, বিশেষণ-নবাবী)।

ছ. শুদ্ধ পদ চিহ্নিত করা:

১। বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক শব্দকে বলে-	বিধেয়, উদ্দেশ্য, শব্দ, পদ
২। পদের শ্রেণী বিভাগ	৮টি, ১০টি, ২টি, ৫টি
৩। আত্মবাচক সর্বনাম-	আমি, তোমারে, সে তাহাকে
৪। গুণ বাচক বিশেষ্য কোনটি?	সৎ, সততা, গুচ্ছ, পাল
৫। পদান্বয়ী অব্যয় কোনটি?	সাপটি, বিনা, লাভ, মহী
৬। সংযোজক অব্যয় কোনটি?	এক, তীর, এবং, কিংবা।

ছ. প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন করে বাক্যে সংস্থাপন করা:

বাঘ, আকাশ, পাঁক, ফল, মিতা, স্বপ্ন, দয়া, লঘু, গুরু, নীল (উত্তর সঙ্কেত-বাঘ+আ=বাঘা। বাক্য = বাঘা বাঘা জওয়ান যুদ্ধে পরাজিত হল।)

এই পর্যায়ে অনুশীলনের জন্য আপনি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ্য-বিশেষণে এবং বিশেষণ-বিশেষ্যে পদান্তরের জন্য কতিপয় পদের তালিকা দিতে পারেন কি ?

পর্ব-গ : কর্মপত্র (অনুশীলনের জন্য)

নিম্নে প্রদত্ত সঙ্কেতগুলো অনুসরণ করে পদের সংজ্ঞা গঠন করুন –

- অর্থোবোধক বর্ণ
- অর্থোবোধক বর্ণ সমষ্টি
- শব্দ/ অর্থবোধক শব্দসমষ্টি

- বিভক্তি
- বিভক্তিযুক্ত শব্দ
- বাক্য
- অর্থবোধক বাক্য

উদাহরণ : (অর্থবোধক পাঁচটি বাক্যের উদাহরণ লিখুন)

১.

২.

৩.

৪.

৫.

বাক্যগুলো বিশ্লেষণ করে, প্রত্যেকটি বাক্য থেকে শব্দগুলোকে আলাদা করে লিখুন। পদের শ্রেণীবিভাগগুলোর নাম লিখে সেগুলোর পাশে শব্দগুলোকে লিখুন। শব্দগুলো দিয়ে পুনরায় একটি করে বাক্য গঠন করুন।

উদাহরণ: শিশুরা হাসে।
১. শিশুরা – বিশেষ্য পদ – শিশুরা খেলা করে।

২. হাসে – ক্রিয়া পদ – বিজয়ী শিশুরা পুরস্কার পেয়ে হাসে।

নিচের ছকটিতে প্রতিটি পদের উপযোগী বাক্যের উদাহরণ গঠন করে ধারাবাহিকভাবে লিখুন।

বিশেষ্য	**বিশেষণ**	**সর্বনাম**	**অব্যয়**	**ক্রিয়া**
১.	১.	১.	১.	১.
২.	২.	২.	২.	২.
৩.	৩.	৩.	৩.	৩.
৪.	৪.	৪.	৪.	৪.
৫.	৫.	৫.	৫.	৫.

পদের উদাহরণ সংবলিত অনুশীলন

শিক্ষক পাঠ বিশ্লেষণকালে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ খাতায় প্রত্যেককে, প্রত্যেকটি পদ অনুসরণ করে, একটি করে বাক্য লিখে, পদ চিহ্নিত করতে বলবেন।

বিশেষ্য	বিশেষণ
১. **ঢাকা** বাংলাদেশের রাজধানী(সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য)	১.**নীল** আকাশে **সাদা** মেঘ ভাসছে (বিশেষ্যের বিশেষণ)।
২. **মানুষ** মানুষকে ভালোবাসে (জাতিবাচক বিশেষ্য)	২. মেয়েটি **বড়** চঞ্চল **বড়** দুরন্ত (বিশেষণের বিশেষণ)।
৩. **লোহা** থেকে **ইস্পাত** হয় (বস্তুবাচক বিশেষ্য)	৩. **সেই** তুমি আজ এসেছ? (সর্বনামের বিশেষণ)।
৪. **সভায়** লোক সমাগম হয়নি (সমষ্টিবাচক বিশেষ্য)	৪. সূর্য **ধীরে ধীরে** উঠছে (ক্রিয়া বিশেষণ)।
৫. **দয়া** একটি মহৎ গুণ (গুণবাচক বিশেষ্য)	
৬. **মনুষ্যত্ব** মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ (ভাববাচক বিশেষ্য)	

সর্বনাম	অব্যয়
১. **আমি** বাড়ি যাই (পুরুষবাচক সর্বনাম)।	১.আমি আম **আর** জাম খাই (অন্বয়ী অব্যয়)।
২. **ঐগুলো** তোমার বই (নির্দেশক সর্বনাম)।	২. **আহা !** কি সুন্দর চাঁদ (অনন্বয়ী অব্যয়)।
৩. **কেউ** কিছু জানে কি? (অনির্দেশক সর্বনাম)।	৩. রানু **অথবা** উষা কাজটি করেছে(বিয়োজক অব্যয়)
৪. **সব** ভালো যার শেষ ভালো তার (সাকুল্যবাচক সর্বনাম)।	৪. তুমি **তো** আসোনি (বাক্যালঙ্কার অব্যয়)।
৫. **যিনি** পরিশ্রমী **তিনি** উন্নতি করবেন (সাপেক্ষ সর্বনাম)।	৫. **না,** আমি খাবনা (অনুজ্ঞাবাচক অব্যয়)
৬. **কেন** তুমি একাজ করলে?(প্রশ্নবাচক সর্বনাম)।	৬. **টুপ্‌টাপ** বৃষ্টি পড়ছে (অনুকার অব্যয়)

ক্রিয়া

১. আমি বই **পড়েছি** (সমাপিকা ক্রিয়া)।
২. তুমি চলে **যাও** (অসমাপিকা ক্রিয়া)।
৩. কানে **ঝিমঝিম** করছে (মিশ্র ক্রিয়া)।
৪. তারা **গান** গায় (সকর্মক ক্রিয়া)।
৫. তারা খুব ভাল খেলা **খেলেছে** (অকর্মক ক্রিয়া)।

ইউনিট ৩ **অধিবেশন ১**

মূল শিখনীয় বিষয়

বাংলা ব্যাকরণ : পদপ্রকরণ, সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ বিশ্লেষণ

সাধারণভাবে, বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলে। কতগুলো পদের সমন্বয়ে একটি অর্থবোধক বাক্য গঠিত হয়। এভাবে বিভিন্ন বাক্যের মাধ্যমে মানুষ তার মনের ভাবকে ভাষায় রূপ দেয়। ভাষা মানবমনের অভিব্যক্তি ও ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম। ভাষা প্রকাশে অর্থবোধক শব্দ, পদ ও বাক্য গঠনের প্রয়োজনীয়তা তাই অপরিসীম।

পদের সংজ্ঞা : অর্থবোধক বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি দিয়ে গঠিত কোন শব্দ বাক্যে বিভক্তিযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হলে, তাকে পদ বলে। যেমন- শিশুরা হাসে, (শিশু+রা, হাস্+এ)।

পদ প্রকরণ : ব্যাকণের যে অংশ শব্দ ও শব্দের গঠন, শব্দের শ্রেণীবিভাগ, পদ, পদের পরিচয়, প্রত্যয়, বচন, শব্দরূপ, কারক, সমাস, ক্রিয়া, ক্রিয়ার কাল, ভাব, শব্দের ও পদের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করে তাকে পদপ্রকরণ বলে।

পদ প্রধানত ২ প্রকার : নাম পদ ও ক্রিয়া পদ। বিভক্তিযুক্ত শব্দকে নাম পদ এবং বিভক্তি যুক্ত ক্রিয়ার মূলকে ক্রিয়াপদ বলে।

কিন্তু পদপ্রকরণ তথা পদ নিয়ে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন আছে। তদনুযায়ী, বাক্যের সামগ্রিকতা থেকেই 'পদ' তথা 'পদ প্রকরণ'-কে দেখতে হবে। বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে পদ বা শব্দকে যে শ্রেণীকৃত করা যায় না-কারণ, ভাষার যে সমস্ত শব্দ থাকে সেগুলো বাক্যের বিভিন্ন স্থানে/অংশে বসেই বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। তাই শব্দ/পদরাশিকে অর্থ ও বাক্যের স্থান অনুসারেই নানা শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা উচিত। এই বিবেচনায় এক বা একাধিক শব্দের গুচ্ছকেও 'পদ' অভিধা দেয়া সম্ভব।

প্রথা এবং পূর্বসূরিদের অনুসরণে বাংলায় ৫ প্রকার পদ স্বীকৃত : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া পদ। কিন্তু প্রধান পদগুলোকে নানা শ্রেণী-উপশ্রেণীতে বিভক্ত করে পদের সংখ্যা বেশ বাড়ানো হয়েছে। সেগুলোর সব খুঁটিনাটি আয়ত্তকরণ ও শিক্ষাদান খুব কার্যকর নয়, এবং তার প্রয়োজনও নাই। বরং শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ও বুদ্ধিবৃত্তিকে সক্রিয় করে, উদাহরণ থেকে পদ প্রকরণের পরিচয় উপলব্ধ করানোই শ্রেয়তর। আরোহী পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে বাক্যস্থিত পদসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে অভ্যস্ত করাতে হবে।

কয়েক ধরনের উদাহরণে শব্দ ও পদের পারস্পরিকতা স্পষ্ট করা যায় :

১. রুবেল একটি মোবাইল ফোন কিনেছে। < ৫টি শব্দ, ৩টি পদ >
২. দিনের বেলা কাজের সময় কাজ করো। < ৬টি শব্দ, ৪টি পদ >
৩. এমন চমৎকার মানুষ হয় না। < ৫টি শব্দ, ৫টি পদ >

মূল্যায়নঃ

সংক্ষিপ্ত উত্তর মূলক প্রশ্ন :

১. পদ তথা পদ প্রকরণের সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর সংজ্ঞা/পরিচয় কীভাবে দেয়া যায়? পদ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা কতটুকু গ্রাহ্য আর কতটুকু এর সঙ্গে নতুন যোগ করা যায়?

২. বাংলায় প্রচলিত ৫ প্রকার পদের আরো অনু-বিভাজন করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? আপনি শিক্ষার্থীদেরকে সহজে কীভাবে এর সকল শ্রেণীর সঙ্গে পরিচিত করাবেন?

৩. পদপ্রকরণ অনুশীলনের ক্ষেত্রে কোন-কোন দিকগুলো কী-কীভাবে কার্যকর করা যায়?

সম্ভাব্য উত্তর :

পর্ব-ক :

১. ব্যাকরণের 'পদ' বিষয়টি সম্পর্কে প্রথাগত ধ্যান-ধারণা থেকে উত্তরণ আবশ্যক।

২. পদকে বাক্যমধ্যস্থিত উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে সেগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই বিচার করতে হবে।

৩. শ্রেণী-উপশ্রেণীর জটিলতা না বাড়িয়ে বরং শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ও বুদ্ধিবৃত্তিকে সক্রিয় করে উদাহরণ থেকে পদ প্রকরণের পরিচয় উপলব্ধ করানো উচিত।

৪. পদের পাঠদান কৌশলের ক্ষেত্রে আপনার নিজস্ব পরিকল্পনা সংক্ষেপে ব্যক্ত করুন।

পর্ব-খ :

অনুশীলন ॥

১.বিশেষ্য থেকে বিশেষণে পদান্তর করা :

আসন, আহার, আঘাত, আদেশ, আমন্ত্রণ, আত্মা, আশ্রয়, আরাধনা, আবরণ, জগৎ, জরা।

২.বিশেষণ থেকে বিশেষ্যে পদান্তর করা :

উদ্যত, উত্তপ্ত, উপকৃত, কুলীন, কথিত, কেজো, কালীন, উচ্ছ্বসিত, উদিত, কল্পিত, কেঠো, কাবুলি, গব্য, গৃহীত, জটিল, জ্ঞাত।

ইউনিট ৩ **অধিবেশন ২**

ব্যাকরণ : প্রকৃতি-প্রত্যয়- সংজ্ঞা; প্রকৃতি, প্রত্যয় বিশ্লেষণ ও চিহ্নিতকরণ

ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিতে অর্থসংশ্লিষ্টতা ঘটলেই শব্দ গঠিত হয়- একথা বলাই যথেষ্ট নয়। কেননা, শব্দের গঠন বাংলায় নানাভাবেই হতে পারে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতির পৃথক-পৃথক অথবা মিশ্ররীতির অনুসরণে প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্বারা গঠিত শব্দকে প্রধান আলোচনায় আনা হয়। প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অন্তর্নিহিত স্বরূপ ও কার্যধারা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা শিক্ষকের না থাকলে তিনি যেমন নিজে বাংলা ভাষার উপর দখল অর্জন করতে পারেন না, তেমনি ছাত্র-ছাত্রীকে ভাষা শিক্ষাদানে পুরোপুরি সফল হতে পারেন না। ভাষা-প্রকৌশলের অন্যতম জ্ঞাতব্য প্রকৃতি ও প্রত্যয়।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের সংজ্ঞা প্রদান ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলা ও সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় যোগে গঠিত/সাধিত শব্দের উদাহরণ ও গঠন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন।
- বাংলা সংস্কৃত ও বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে শব্দের উদাহরণ থেকে প্রত্যয় চিহ্নিতকরণে সক্ষমতা লাভ করবেন।
- প্রত্যয়যোগে শব্দ বিশ্লেষণ ও গঠন কৌশল আয়ত্ত করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা প্রদান

*প্রকৃতি*কে সম্যকভাবে বুঝতে হলে আবার স্মরণ করতে হবে শব্দের/পদের শ্রেণীকরণকে। ৫ প্রকার পদের মধ্যে ক্রিয়াপদ ছিল সম্পূর্ণই বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শুধু এক ধরনের শব্দেই কোনো না কোনো 'কাজ' বা 'কিছু করা' বোঝায়। বাক্যের মধ্যে সেগুলোকেই ''ক্রিয়াপদ" বলা হয়েছে। প্রকৃতিকে বোঝার জন্য ক্রিয়াপদের বিশ্লেষণ দরকার।

ক্রিয়াপদের থাকে একটা মূল অংশ- ধাতু, এবং সঙ্গে থাকে বিভক্তি। যেমন–
কর্ (ধাতু) + এ(বিভক্তি) =করে; লিখ্ (ধাতু)+ এ(বিভক্তি)=লিখে। সেরকম - ধর্+আ=ধরা, চল্+আ=চলা

আবার, শব্দের সঙ্গেও ব্যাকরণিক উপাদান 'বর্ণসমষ্টি' যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ হতে পারে। যেমন - ঢাকা (শব্দ)+আই (বর্ণসমষ্টি) = ঢাকাই (সাধিত শব্দ), জ্বল (শব্দ)+ অন্ত (বর্ণসমষ্টি) = জ্বলন্ত (সাধিত শব্দ)

কাজেই, ক্রিয়াপদের মূল বা শব্দ- যে দুয়ের সঙ্গে ব্যাকরণিক উপাদান যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়, তা-ই **প্রকৃতি**। ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বলা হয় **ধাতু-প্রকৃতি**, শব্দের ক্ষেত্রে **নাম-প্রকৃতি**। অন্যভাবে বললে, সাধিত শব্দের শব্দের মূলকে বলা হবে ***প্রকৃতি*** । <সাধিত শব্দকে তাই বিশ্লেষণ বা ভাগ করা যায়; কিন্তু মনে রাখতে হবে, ধাতুকে আর ভাঙা যায় না।>

অন্য দিকে, **প্রত্যয়** কিন্তু নিজে-নিজে প্রকাশিত হয় না। কারণ, প্রকৃতির সাথে যে ব্যাকরণিক উপাদান (শব্দখণ্ড, বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি/বর্ণগুচ্ছ) যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তা-ই ***প্রত্যয়*** । যেমন -

√চল্ (মূল ক্রিয়াপদ) + আ (প্রত্যয়) = চলা; ঢাকা (মূল শব্দ) + আই (প্রত্যয়) = ঢাকাই।

প্রত্যয় ২ রকম এবং কী বা কোন রকম প্রত্যয় তা নির্ধারিত হবে ধাতু বা মূলশব্দ অর্থাৎ 'প্রকৃতি' বিচার করে। তবে সূক্ষ্ম বিচারে প্রত্যয় ৫ প্রকার। পৃথক দুই দৃষ্টিকোণ থেকে এটা দেখা যায়:

প্রথমটি এরকম হতে পারে :

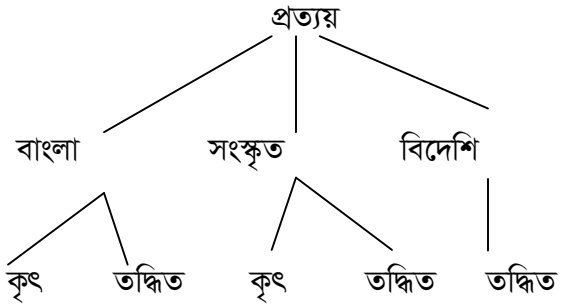

এটিতে বিদেশি প্রত্যয়কে একেবারে আলাদা এক শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে। কিন্তু প্রচলিতভাবে তা করা হয় না। মূলত ২ শ্রেণীর প্রত্যয় বিবেচনা করে বিদেশি প্রত্যয়কে একটি উপ-শ্রেণীতেই ধরার রীতি প্রচলিত। তা আবার, এভাবেও হতে পারে :

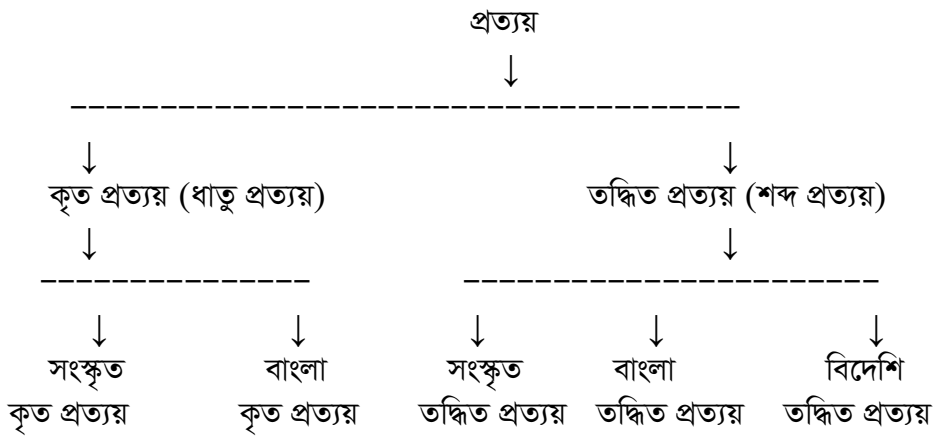

এরূপ প্রধান বিভাজন ছাড়াও প্রত্যয়ের সংস্কৃত, বাংলা ও বিদেশী রূপ নিয়েও শ্রেণীকরণ হতে পারে। খাঁটি বাংলা শব্দ যেসব প্রত্যয় দ্বারা গঠিত সেগুলোকে খাঁটি বাংলা প্রত্যয় বলা উচিত : এক্ষেত্রে (১) খাঁটি-বাংলা কৃৎপ্রত্যয় এবং (২) খাঁটি-বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় বিবেচনা করতে হয়। যেমন-

√কাঁদ্+ অ (ও) = কাঁদ (কাঁদো); বোন+আই = বোনাই

লিঙ্গ ভিত্তিতেও **লিঙ্গ প্রত্যয়** হতে পারে।

একই সঙ্গে বিবেচিত হয় বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়– শব্দের সঙ্গে বিদেশি প্রত্যয় যোগে যা গঠিত হয়।

যেমন- গরিব+আনা=গরিবানা; সওদা+গর=সওদাগর (সদাগর); নজর+বন্দ=নজরবন্দ ।

(১) সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় : সংস্কৃত ধাতুর পরে সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয় যুক্ত হলে তাকে সংস্কৃত কৃত প্রত্যয় বলে। যেমন - তব্য দৃশ+তব্য=দ্রষ্টব্য, অনীয় কৃ+অনীয়=করণীয়, অনট্ (অন) স্না + অনট্ =স্নান, ক্তি(তি) নী+তি=নীতি, ঘঞ(অ) পচ্ +ঘঞ=পাক/ যুজ্+ঘঞ=দেখ ইত্যাদি।

(২) বাংলা কৃৎপ্রত্যয় : বাংলা ধাতুর পরে যখন বাংলা কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হয় তখন তাকে বাংলা কৃৎপ্রত্যয় বলে। যেমন-

অন্ নাচ+অন=নাচন, আ খা+আ=খাওয়া, ইয়া হাস+ইয়া= হাসিয়া, আই ধু+আই=ধোয়াই, ইয়ে খেল+ইয়ে=খেলিয়ে ইত্যাদি।

(৩) সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় : সংস্কৃত শব্দের পরে সংস্কৃত প্রত্যয় যোগ হলে তাকে সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন -

তা সৎ+তা= সত্তা, তর-তম বৃহৎ+তম=বৃহত্তম/ প্রিয়+তর=প্রিয়তর, ইয়স-ইষ্ঠ বৃদ্ধ+ইয়স=বধীয়স/বৃদ্ধ+ইষ্ঠ=জ্যেষ্ঠ, ত্ব প্রভু+ত্ব=প্রভুত্ব ইত্যাদি।

(৪) বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় : বাংলা শব্দের পরে বাংলা প্রত্যয় যোগ হলে তাকে বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন -

মি পাক+মি=পাকামি, আনি নাক+আনি=নাকানি, আই চোর+আই=চোরাই, পনা দুরন্ত + পনা=দুরন্তপনা , খানা মুদি+খানা=মুদিখানা, আমি পাগল+আমি=পাগলামি, টিয়া/টে ভাড়া+টিয়া=ভাড়াটিয়া/ ভাড়া+টে=ভাড়াটে ইত্যাদি।

(৫) বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় : বিদেশি শব্দের পরে বিদেশি প্রত্যয় যোগ হলে তাকে বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন-

আনা নজর+আনা=নজরানা, গিরি কেরানী+গিরি=কেরানীগিরি, সই টিপ+সই=টিপসই, স্তান গুল+স্তান=গুলিস্তান, চা বাগ+চা=বাগিচা ইত্যাদি।
প্রত্যয় নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে। এখন আপনি এর কিছু সহজ ও স্মর্তব্য উদাহরণ দিতে পারেন কি?

পর্ব-খ : বিভিন্ন প্রত্যয় যোগে শব্দ বিশ্লেষণ ও সাধিত শব্দযোগে বাক্য গঠন

এই পর্বে প্রশিক্ষার্থী শিক্ষকের জন্য কিছু কার্যকর ও সংক্ষিপ্ত সহাজ সারণী উপস্থিত করা হচ্ছে যা থেকে তাঁরা ব্যাকরণের এই বিষয়টিকে দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারেন। প্রদত্ত সারণীগুলো শিক্ষক নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন, প্রয়োজনে নোট নেবেন এবং নিজের জন্য একটা কর্মপন্থা স্থির করে শিক্ষাদানে অগ্রসর হবেন। তবে, এই উদাহরণগুলোই শেষ কথা নয়, পরিস্থিতি সাপেক্ষে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত পন্থাও গ্রহণ করা যায়।

শিক্ষকের পক্ষে বাংলা, সংস্কৃত ও বিদেশি প্রত্যয়ের সম্যক পরিচিতি তুলে ধরা অত্যাবশ্যক। এ প্রসঙ্গে তাঁর পক্ষে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন শব্দের বিশ্লেষণ পদ্ধতি। এর জন্য তিনি বিভিন্ন প্রত্যয় নিষ্পণ্ন সাধিত শব্দ তালিকা তৈরি করবেন (প্রয়োজনে পোস্টার পেপারে তালিক বানিয়ে নিয়ে, তা বোর্ডে ঝুলিয়ে), তা থেকে শব্দসমূহ চিহ্নিত করে প্রত্যয় বিচ্ছিন্ন করবেন।

যেসব প্রত্যয় নিষ্পণ্ন শব্দের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বেশি অসুবিধা হয় সেগুলোর নিম্নরূপ দু' একটা তালিকা করা যেতে পারে:

ক. বাংলা, সংস্কৃত কৃত প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয় সংক্রান্ত তালিকা :

বাংলা কৃৎপ্রত্যয়	সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়	বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়	সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়
বাংলা প্রত্যয়: অ, উ, ও, আত, অতা, অন, অনা, অনি, ওয়া, আই, আন, আনি, আরি, উয়া, অইয়া ইত্যাদি।	সংস্কৃত প্রত্যয়: ইষ্ণু, অনট্, শতৃ, অৎ, বতক, অক্, ঘঞ, শানচ্-শান, যৎ, ন্যৎ, ক্যপ ইত্যাদি।	বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়: অটিযা>টে, আই, অমা অউয়া, আস, আমি, আর, উবি, আরা, আল, আলা, ই, ঈ, ইয়া, উক, পনা, পারা।	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ঃ অঞ>অন্,ণ, ষ্ণি,+ৈ, ইতচ্>ইত, ইন্, বিতল> ইল, ষ্ণীয়>ঈয়, তনষ>তন, তা-ত্ব, য্যণ, যৎ
সাধিত শব্দঃ	**সাধিত শব্দঃ**	**সাধিত শব্দঃ**	**সাধিত শব্দঃ**
√চল্ + আ = চলা	√চল+ইষ্ণু= চলিষ্ণু	ঘোলা+অটিয়া>টে = সাধিত শব্দ= ঘোলাটে	শিব+অঞ>অ = শৈব।
√ঝুল্+আ = ঝুলা	√বৃধ+ইষ্ণু= বর্ধিষ্ণু	মিঠা +আই = মিঠাই	দশরথ+ষ্ণি>ই= দাশরথি।
√ছুট্ + আ = ছুটা	√কৃ + ক্ত = কৃত	চাম+আর= চামার	ন্যায়+ ষ্ণিক>ইক=নৈয়ায়িক
√সাজ্+আ= সাজা	√ধ + ক্ত = ধৃত	কাঁসা+আরি= কাঁসারি	পল্লব+ইতচ্>ইত=পল্লবিত।
√কাঁদ্ + অ(ও) = √কাঁদ	√গৈ + ক্ত = গতি	জোর+আলো=জোড়াল	
√ঢাক্ + অনা = √ঢাক্না	√মহ্+ ক্ত = মন্ধ	বাড়ি+অলা=বাড়িঅলা	
√মান্ + অত = √মানত	√শ্রু+অনট = শ্রবণ	ঢাক+ঈ=ঢাকা	
√ছাঁক্+অনি= ছাকনি	√চল্+অৎ= চলৎ> চলন	হালি+ইয়া=হালিয়া	
√ছা+উনি= ছাউনি	√ভাস্ + শানচ> শান = ভাসমান	সাতার+উ= সাতারু	
√চল্+অন্ত = চলন্ত	√কৃ+ক্তিন>তি= কৃতি	ফর্সা+পানা= ফর্সাপানা	
√চাহ্+ওয়া=√চাওয়া	√বৃৎ+শাব>মান = বর্তমান		

খ. তদ্ধিত ও কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত শব্দ তালিকা :

তদ্ধিত প্রত্যয় (বাংলা)

দোকানী = দোকান + ঈ
জালিয়া/ জেলে = জাল+ ইয়া
ঢালু = ঢাল + উ
দাতাল = দাত + আল
ভাড়াটে/ ভাড়াটিয়া = ভাড়া + আটিয়া
মেঘলা = মেঘ + লা

কৃৎ প্রত্যয় (বাংলা)

ঘুর = ঘুর্ + অ
পড়া = পড়্ + আ
চালান = চল্ + আন
ডুবুরী = ডুব্ + আরি/ উরি
মাতাল = মাত্ + আল
বহতা = বহ্ + তা

তদ্ধিত প্রত্যয় (সংস্কৃত)

কুসুমিত = কুসুম + ইত
নীলিমা = নীল + ইমন্
গরিষ্ঠ = গুরু + ইষ্ঠ
জ্ঞানিন = জ্ঞান + ইন
বন্ধুত্ব = বন্ধু + ত্ব
মেধাবী = মেধা + বিন (বী)
গুণবান = গুণ + বতুপ

কৃৎ প্রত্যয় (সংস্কৃত)

নয়ন = নে + অনট্
পঠিত = পিঠ্ + ক্ত
গতি = গিম্ + ক্তি
করণীয় = কৃ + অনীয়
দেয় = দে্ + য
ক্ষয় = ক্ষি + অচ্
নম্র = নিম্ + র

তদ্ধিত প্রত্যয় (বিদেশি)

কারিগর = কারি + গর
জুতসই = জুত + সই
গাড়োয়ান = গাড়ি + ওয়ান
ছেলেপনা = ছেলে + পনা
বিবিয়ানা = বিবি + আনা

গ. সাধিত শব্দ এবং তা দিয়ে গঠিত বাক্য-উদাহরণ

কৃৎপ্রত্যয় নিষ্পণ্ন/

√পড়+অন্ত=পড়ন্ত
বাক্য: ছেলেটি পড়ন্ত বিকেলে বাড়ি ফিরল।

তদ্ধিত প্রত্যয় নিষ্পণ্ন

ঘর+আকুয়া>উয়া>ওয়া=ঘরোয়া বাক্য: ঘরোয়া পরিবেশে মেয়েটি জন্মদিন পালন করল।

উপর্যুক্ত রূপ উদাহণে শ্রেণী-অনুশীলনী করানো যায়।

পর্ব-গঃ কর্মপত্র : প্রকৃতি-প্রত্যয়-সংজ্ঞা, প্রকৃতি প্রত্যয় বিশ্লেষণ ও চিহ্নিতকরণ

প্রশিক্ষার্থী শিক্ষকগণ প্রথম নিজে-নিজে, নিচের ছকটিতে প্রদত্ত শব্দগুলোর প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় করবেন এবং প্রত্যয়ের নাম লিখবেন। পরবর্তী পর্যায়ে, অনুরূপ সহজ ও কার্যকর সংক্ষিপ্ত ছক তিনি শ্রেণী-প্রস্তুতি উপকরণ হিসেবে তৈরি করে, শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাবেন।

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
সম্রাট	----------	----------
কারক	----------	----------
জেলে	----------	----------
চড়াও	----------	----------
ছেলেমি	----------	----------
শৈশব	----------	----------
যৌগিক	----------	----------
বোমারু	----------	----------
দিশারী	----------	----------
ডাকাত	----------	----------
চাহ্নি	----------	----------
চমক	----------	----------
নেতা	----------	----------
দন্ত্য	----------	----------
বাঁশী	----------	----------
সর্পিল	----------	----------
দেখিয়াছি	----------	----------
দোলনা	----------	----------
জীয়ন্ত	----------	----------
মিঠাই	----------	----------
রান্না	----------	----------
ঝাড়ন	----------	----------
জাঁক	----------	----------
বসতি	----------	----------
ওকালতি	----------	----------
ভাজি	----------	----------
মেয়েলি	----------	----------
চালুনি	----------	----------
তামাটে	----------	----------

এগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের কীভাবে লিপিবদ্ধ করা দরকার বলে আপনি মনে করেন?

ইউনিট ৩ **অধিবেশন ২**

মূল শিখনীয় বিষয়

ব্যাকরণ : প্রকৃতি-প্রত্যয়- সংজ্ঞা; প্রকৃতি, প্রত্যয় বিশ্লেষণ ও চিহ্নিতকরণ

শব্দের গঠন বাংলায় নানা ভাবেই হতে পারে; প্রকৃতি-প্রত্যয় নিষ্পণ্ন শব্দ তার অন্যতম উদাহরণ। তাই, ভাষা-প্রকৌশলের অন্যতম জ্ঞাতব্য প্রকৃতি ও প্রত্যয়। এদুয়ের পারস্পরিকতা অনুধাবন শিক্ষকের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

শব্দ ও ধাতু : অর্থযুক্ত বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টিকে শব্দ বলে। শব্দে সাধারণত নাম, গুণ ইত্যাদি বোঝায়। শব্দ যখন ক্রিয়াবাচক কিছুকে বোঝায় তখন তাকে ধাতু বলে।

প্রকৃতি : সাধিত শব্দের মূলকে প্রকৃতি বলে। নাম পদের মূল অংশকে নাম প্রকৃতি বলে।

প্রত্যয় : যে বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি ধাতুর পর/উত্তর যুক্ত হয়ে বিশেষ্য প্রভৃতি নাম শব্দ গঠন করে অথবা নাম-শব্দ বা অব্যয়ের পর/উত্তর যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে প্রত্যয় বলে। প্রত্যয় ২ প্রকার– কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়। তবে সূক্ষ্ম বিচারে প্রত্যয়ের আরো বিভাজন হয়; তদনুসারে প্রত্যয় মোট ৫ ভাগে বর্ণিত হতে পারে।

কৃৎ-প্রত্যয়: যে প্রত্যয় ধাতুর পরে যুক্ত হয় তাকে কৃৎপ্রত্যয় বলে। যথা= খেল+আ, কৃৎ প্রত্যয় আবার ২ প্রকার। বাংলা কৃৎপ্রত্যয় ও সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়।
কৃদন্ত শব্দের মূল বোঝাতে '√' চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন= √বিল্+আ= বলা।

তদ্ধিত প্রত্যয়: যে প্রত্যয় বিশেষ্য বা নাম শব্দের বা অব্যয়ের পর যুক্ত হয় তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যথা- রোগ+আ = রোগা, ঢাকা+ইয়া= ঢাকাইয়া।

বাংলা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রত্যয় নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে। এর জন্য প্রকৃষ্ট উপায় বিভিন্ন প্রত্যয় যোগে শব্দ বিশ্লেষণ ও সাধিত শব্দযোগে গঠিত বাক্য থেকে প্রত্যয় নির্ণয় অনুশীলন।

তাই, শিক্ষককে জোর দিতে হবে বাংলা, সংস্কৃত ও বিদেশি প্রত্যয়ের সম্যক পরিচিতি তুলে ধরায়। এপ্রসঙ্গে তাঁর পক্ষে প্রথমেই অত্যাবশ্যক সংক্ষেপে শব্দের বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা। এসবের কিছু নমুনা এরকম হতে পারে:

তদ্ধিত ও কৃৎ প্রত্যয়যুক্ত শব্দ বিশ্লেষণঃ

তদ্ধিত প্রত্যয় (বাংলা)
দাঁতাল = দাঁত + আল
ভাড়াটে/ ভাড়াটিয়া = ভাড়া + আটিয়া
মেঘলা = মেঘ + লা

কৃৎ প্রত্যয় (বাংলা)
ডুবুরী = ডুব্ + আরি/ উরি
মাতাল = মাত্ + আল
বহতা = বহ্ + তা

তদ্ধিত প্রত্যয় (সংস্কৃত)
বন্ধুত্ব = বন্ধু + ত্ব
মেধাবী = মেধা + বিন (বী)
গুণবান = গুণ + বতুপ

কৃৎ প্রত্যয় (সংস্কৃত)
দেয় = দে্ + য
ক্ষয় = ক্ষি + অচ্
নম্র = নিম্ + র

তদ্ধিত প্রত্যয় (বিদেশি)
গাড়োয়ান = গাড়ি + ওয়ান
ছেলেপনা = ছেলে + পনা
বিবিয়ানা = বিবি + আনা

কৃৎপ্রত্যয় নিষ্পণ্ন/সাধিত শব্দ
উক্ত = √বচ্ + ক্ত
স্মরণ = √স্মৃ + অনট্
দেখা = √দেখ্ + আ
হাসি = √হাস্ + ই।

তদ্ধিত ও কৃৎ প্রত্যয়যুক্ত/শব্দযুক্ত বাক্য থেকে প্রত্যয় নির্ণয় : শ্রেণী অনুশীলন

মূল্যায়নঃ

১. প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের পরিচয় শিক্ষার্থীদের কাছে সবচেয়ে সহজে কীভাবে দেয়া যায়?

২. প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ ও চিহ্নিতকরণে আপনি কী ধরনের কৌশল ব্যবহার করতে চান ?

৩. বিদেশি প্রত্যয়কে কি আলাদা কোনো প্রত্যয় হিসেবে বিবেচনা করা, নাকি তদ্ধিত প্রত্যয়েরই একটি বিশেষ রূপ হিসেবে দেখা উচিত?

সম্ভাব্য উত্তর :

পর্ব-ক :

প্রকৃতি		প্রত্যয়	প্রত্যয়গঠিত শব্দ	প্রত্যয়ের নাম
√জ	+	অ	জয়	সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়
নর	+	আয়ন	নারায়ণ	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
ঢাকা	+	আই	ঢাকাই	তদ্ধিত প্রত্যয়
√রাঁধ	+	অনী	রাঁধুনী (রাঁধুনি)	বাংলা কৃতপ্রত্যয়
নিম	+	আই	নিমাই	বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়
চশম	+	খোর	চশমখোর	বিদেশী প্রত্যয়
ঠাকুর	+	আইন	ঠাকুরাইন	লিঙ্গ প্রত্যয় (স্ত্রী প্রত্যয়)

পর্ব-খ : শ্রেণী অনুশীলনীর কর্ম-তালিকা শিক্ষক তৈরি করবেন।

পর্ব-গ :

প্রদত্ত শব্দ	**প্রকৃতি+ প্রত্যয়**	**প্রত্যয়ের নাম**
সম্রাট	সম্+রাট	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঢাকন	ঢাক্+ অন	কৃৎ প্রত্যয়

ইউনিট ৩ **অধিবেশন ৩**

সন্ধিঃ বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ ও বাংলা ভাষায় সন্ধির প্রয়োজনীয়তা

সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন। ব্যাকরণে ধ্বনির সংগে ধ্বনির মিলন হলে সন্ধি হয়। দুটি ধ্বনি একই পদে বা সন্নিহিত দুই পদে পাশাপাশি থাকলে দ্রুত উচ্চারণের ফলে সেই দুটি ধ্বনির মধ্যে আংশিক বা পূর্ণভাবে মিলন হয়। সন্নিহিত ধ্বনির এরূপ মিলন বা লোপ কিংবা পরিবর্তনকে সন্ধি বলে।

তাড়াতাড়ি কথা বলার সময় একটি শব্দের শেষ ধ্বনি আর একটি শব্দের প্রথম ধ্বনি আমরা সর্বদাই মিলিয়ে এক করে দিয়ে থাকি। যেমন- হিম এবং অচল শব্দ দুটি দ্রুত উচ্চারণের ফলে হয়ে যায় হিমাচল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উচ্চারণ প্রকৃতিই সন্ধির মূল। শ্রেণীকক্ষে সন্ধির বিষয়বস্তু পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষককে এই উচ্চারণ প্রকৃতির দিকটিই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা আবশ্যক।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- বিভিন্ন প্রকার সন্ধির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রত্যেক প্রকার সন্ধি সাধনের পাঁচটি করে নিয়ম বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- শ্রেণীতে সন্ধি পঠন-পাঠনের উপযোগী পদ্ধতি ও কলাকৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় সন্ধির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : সন্ধির স্বরূপ ও প্রকারভেদ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, রবীন্দ্র (রবি+ইন্দ্র), হিমালয় (হিম+আলয়) এবং চিন্ময় (চিৎ+ময়)-- সন্ধিসাধিত এই শব্দ তিনটির উচ্চারণ প্রকৃতি খেয়াল করুন। দেখা যাবে প্রথমটির ক্ষেত্রে 'ই' ধ্বনির সাথে 'ই' ধ্বনি মিলিত ও রূপান্তরিত হয়ে 'ঈ' ধ্বনি হয়েছে। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে 'অ' ধ্বনির সাথে 'আ' ধ্বনি মিলিত হওয়ার ফলে 'অ' ধ্বনি লোপ পেয়েছে। তৃতীয়টির ক্ষেত্রে পূর্বপদের ৎ বিকৃত হয়ে 'ন' হয়েছে। তাহলে বলা যায়, সন্ধি হচ্ছে দ্রুত উচ্চারণজনিত কারণে ধ্বনির রূপান্তর, লোপ বা বিকৃতি।

সন্ধি মূলত দুই প্রকার-- স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি। বিসর্গ সন্ধি নামে আরেক প্রকার সন্ধি আছে। আসলে তা ব্যঞ্জনসন্ধিরই রকমফের। তবে ব্যাকরণের পাঠ্যপুস্তকে একে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেওয়া হয়। সেই অর্থে বলা যায় সন্ধি তিন প্রকার।

স্বরবর্ণের সাথে স্বরবর্ণের মিলনে হয় স্বরসন্ধি; স্বরবর্ণের সাথে ব্যঞ্জনবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে ব্যঞ্জনবর্ণ মিলে হয় ব্যঞ্জনসন্ধি, আর স্বর বা ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে বিসর্গের মিলনে হয় বিসর্গ সন্ধি।

প্রিয় শিক্ষার্থী, এবার আসুন আমরা শুভেচ্ছা, বিদ্যালয়, দিগন্ত, উচ্ছ্বাস, নমস্কার, নীরব- এই ছ'টি শব্দের ধ্বনিসংযোগ প্রক্রিয়া বিবেচনায় রেখে তিন ভাগে সাজাই এবং তিন প্রকার সন্ধির সংজ্ঞা তৈরি করি।

স্বরসন্ধি	ব্যঞ্জনসন্ধি	বিসর্গ সন্ধি
উদাহরণঃ	উদাহরণঃ	উদাহরণঃ
সংজ্ঞাঃ	সংজ্ঞাঃ	সংজ্ঞাঃ

পর্ব-খ : সন্ধি সাধনের নিয়ম

স্বর, ব্যঞ্জন ও বিসর্গ এই তিন প্রকার সন্ধিই কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে সাধিত হয়। নিয়মগুলোকে সংক্ষেপে নিম্নরূপেও দেখানো যেতে পারে। যেমন-

স্বরসন্ধিঃ	অ/আ+অ/আ = আ অ/আ+ ঋ = (অর ´)	অর্থাৎ অ কার কিংবা আ কারের পর অ কার কিংবা আ কার থাকলে উভয়ে মিলে আ কার হয়।
ব্যঞ্জনসন্ধিঃ	ত/দ+ চ/ছ = চ্চ/চ্ছ ম+যরলবশষসহ = ং	
বিসর্গ সন্ধিঃ	ঃ + অ = ও ঃ +য/র/ল/ব/হ = ও কার	

প্রিয় শিক্ষার্থী, আসুন এবার নিম্নবর্ণিত উদাহরণগুলো সূত্রের নিচে নিচে বসাই। পরে সূত্রগুলো বর্ণনা আকারে খাতায়/ পোস্টার পেপারে লিখি।

দেব+আলয় = দেবালয়	মরু+ উদ্যান = মরূদ্যান	দেব+ঋষি = দেবর্ষি
সূর্য+উদয় = সূর্যোদয়	সম্+বাদ = সংবাদ	পরি+ঈক্ষা = পরীক্ষা
নিঃ + চয় = নিশ্চয়	ততঃ + অধিক = ততোধিক	উৎ+ছেদ = উচ্ছেদ
নমঃ + কার = নমস্কার	মনঃ+হর = মনোহর	শুভ+ইচ্ছা = শুভেচ্ছা
পরি+ছদ = পরিচ্ছদ	দিক্+অন্ত = দিগন্ত	সৎ+জন = সজ্জন

স্বরসন্ধিঃ	**ব্যঞ্জনসন্ধিঃ**	**বিসর্গ সন্ধিঃ**
অ/আ+অ/আ= আ	বর্গের ১ম ধ্বনি+স্বরধ্বনি=বর্গের ৩য় ধ্বনি	ঃ + ক/খ = স্ক/স্খ/ষ্ক
অ/আ+ই/ঈ = ঈ	স্বরধ্বনি + ছ = দ্বিত (চ্ছ)	অ+ ঃ + অ = ও
অ/আ+উ/ঊ = ও	ত/দ + চ/ছ = চ্চ/চ্ছ	ঃ + চ/ছ, ট/ঠ, ত/থ = শিসধ্বনি
অ/আ+ ঋ=অর (-)	ত/দ+ জ/ঝ = জ্জ/জ্ঝ	ঃ +য/র/ল/ব/হ = ও কার
ই/ঈ +ই/ঈ = ঈ	ম্+য ল ব র শ ষ স হ = ং	

সূত্রসমূহ- (বর্ণনা আকারে প্রয়োজনে খাতায় লিখুন): স্বরসন্ধি:

১-

২-

৩-

৪-

৫-

পর্ব-গ : সন্ধি পাঠদানের পদ্ধতি ও কলাকৌশল

শ্রেণীতে ব্যাকরণ পঠন পাঠনের দীর্ঘ দিনের বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে- আরোহ, অবরোহ এবং আরোহ-অবরোহ পদ্ধতি। এই তিনটি পদ্ধতি মূলত সূত্র ও উদাহরণের পর্যায়ক্রমিক উপস্থাপন সংশ্লিষ্ট। ব্যাকরণ যেহেতু ভাষার নিয়ম/সূত্র, শৃঙ্খলা এবং সূত্রসংশ্লিষ্ট উদাহরণের বিচার-বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করে থাকে তাই এ বিষয়টি পাঠদানের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত পদ্ধতিসমূহের গ্রহণযোগ্যতা কোনদিনই কমবে না। তবে ব্যাকরণ পাঠদানকে আরো কার্যকর, অংশগ্রহণমূলক ও অর্থপূর্ণ করার জন্য উপর্যুক্ত পদ্ধতিসমূহের সাথে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিসমূহের বিভিন্ন কলাকৌশলের সমন্বয় সাধন করা যায়। যেমন- শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক সন্ধি পাঠদানের উপস্থাপন অংশের একটি শীর্ষের (শিরোনামের) নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করতে পারেন।

প্রিয় শিক্ষার্থী, কাজগুলো এখানে পর্যায়ক্রমিকভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয় নি। দেখা যাক, আপনি নিজে চিন্তা করে পর্যায়ক্রমিকভাবে সাজাতে পারেন কি না।

উদাহরণ বিশ্লেষণ	১.
সূত্রগঠন	২.
শিক্ষার্থীর অনুশীলন	৩.
ফলাবর্তন	৪.
উদাহরণ উপস্থাপন	৫.

শ্রেণীতে পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েরই সুনির্দিষ্ট কিছু করণীয় রয়েছে। যেমন উপরে বর্ণিত কার্যক্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষকের মূল কাজ হচ্ছে নির্দেশনা দেওয়া ও কাজে সহযোগিতা করা। আর শিক্ষার্থীর কাজ হচ্ছে শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহযোগিতা চাওয়া। কিন্তু শিক্ষক কীভাবে নির্দেশনা দিবেন, কীভাবে উদাহরণ উপস্থাপন করবেন, কীভাবে উদাহরণ বিশ্লেষণ করবেন, কীভাবে ফলাবর্তন দিবেন- সে সবও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। আসুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা সে সব বিবেচনা মাথায় রেখে স্বরসন্ধির তিনটি নিয়ম শেখানোর ক্ষেত্রে শ্রেণীতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর করণীয় সম্পর্কিত তথ্য দিয়ে নিচের ছকটি পূরণ করি এবং পরে মূল শিখনীয় বিষয়ের সংশ্লিষ্ট অংশের সাথে মিলিয়ে নিজ নিজ উত্তরের যথার্থতা যাচাই করি।

শীর্ষ - ক : স্বরসন্ধির ৩টি নিয়ম ---------- ২০ মি.			
কাজের নাম	শিক্ষকের করণীয়	শিক্ষার্থীর করণীয়	সময়
১.উদাহরণ উপস্থাপন			
২. উদাহরণ বিশ্লেষণ			
৩. সূত্রগঠন			
৪.শিক্ষার্থীর অনুশীলন			
৫. ফলাবর্তন			

ইউনিট ৩ **অধিবেশন ৩**

মূল শিখনীয় বিষয়

সন্ধিঃ বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ ও বাংলা ভাষায় সন্ধির প্রয়োজনীয়তা

সন্ধি : কথা বলার সময় পাশাপাশি দু'টো শব্দের বা শব্দাংশের দুটো কাছাকাছি ধ্বনি সহজে উচ্চারণের ফলে মিলিত হয়ে উচ্চারিত হয়। ধ্বনির এ ধরনের মিলনের নামই সন্ধি। অর্থাৎ পাশাপাশি দুটো ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে। যেমন- হিম+আলয় = হিমালয়।

বাংলা সন্ধি দু রকমের : স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি। তবে সংস্কৃতে (তৎসম) স্বর, ব্যঞ্জন ছাড়াও বিসর্গ সন্ধি নামে আরেক প্রকার সন্ধি আছে। সেই অর্থে সন্ধি মোট তিন প্রকারের।

১) স্বরসন্ধি : স্বরধ্বনির সাথে স্বরধ্বনির মিলনের নাম স্বরসন্ধি।
যেমন- হিম+আলয় = হিমালয়

২) ব্যঞ্জন সন্ধি : স্বরধ্বনির সাথে ব্যঞ্জনধ্বনির অথবা ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে ব্যঞ্জনধ্বনির মিলনে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। যেমন- পরি+ছদ = পরিচ্ছদ

৩) বিসর্গ সন্ধি : বিসর্গের সাথে স্বরধ্বনির কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির যে সন্ধি হয় তাকে বিসর্গ সন্ধি বলে। যেমন- ততঃ+অধিক = ততোধিক; নিঃ+চয় = নিশ্চয়

সন্ধি সাধনের নিয়মঃ

বিভিন্ন প্রকার সন্ধি সাধনের নিয়মে বিভিন্নতা রয়েছে। যেমন- স্বরসন্ধিতে স্বরধ্বনির সাথে স্বরধ্বনির মিলন ঘটে। ব্যঞ্জনসন্ধিতে স্বরধ্বনির সাথে ব্যঞ্জনধ্বনির অথবা ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে ব্যঞ্জনধ্বনির মিলন হয়। আর বিসর্গ সন্ধিতে বিসর্গের সাথে স্বর কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির মিলন ঘটে থাকে। বিভিন্ন প্রকার সন্ধি সাধনের উপ-নিয়মগুলোকে সংক্ষেপে নিম্নরূপে দেখানো যেতে পারে।

সন্ধির নাম	সাধনের নিয়ম	
স্বরসন্ধি	অ/আ+অ/আ = আ	: দেব+আলয় = দেবালয়
	অ/আ+ই/ঈ = ঈ	: শুভ+ইচ্ছা = শুভেচ্ছা
	অ/আ+উ/ঊ = ও	: সূর্য+উদয় = সূর্যোদয়
	অ/আ+ ঋ = (অর-)	: দেব+ঋষি = দেবর্ষি
	ই/ঈ +ই/ঈ = ঈ	: পরি+ঈক্ষা = পরীক্ষা

ব্যঞ্জনসন্ধি	বর্গের ১ম ধ্বনি+ স্বরধ্বনি = বর্গের ৩য় ধ্বনি : দিক+অন্ত = দিগন্ত	
	স্বরধ্বনি+ছ = দ্বিত্ব (চ্ছ)	: পরি+ছদ = পরিচ্ছদ
	ত/দ+ চ/ছ = চ্চ/চ্ছ	: উৎ+ছেদ = উচ্ছেদ
	ত/দ + জ/ঝ = জ্জ/জ্ঝ	: সৎ+জন = সজ্জন
	ম+যরলবশষসহ = ং	: সম্+বাদ = সংবাদ
	ঃ + ক/খ = স্ক/স্খ/ষ্ক	: নমঃ+কার = নমস্কার
বিসর্গ সন্ধি	ঃ + অ = ও	: ততঃ + অধিক = ততোধিক
	ঃ + চ/ছ, ট/ঠ, ত/থ = শিশ ধ্বনি	: নিঃ+চয় = নিশ্চয়
	ঃ + য/র/ল/ব/হ = ও কার	: মনঃ + হর = মনোহর

সন্ধি পাঠদান পদ্ধতি : বাংলা ব্যাকরণ পাঠদানের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন অংশের একটি সাধারণ পর্যায়ক্রম রয়েছে। পর্যায়ক্রমটি নিম্নরূপ-

- উদাহরণ উপস্থাপন
- উদাহরণ বিশ্লেষণ
- সূত্র গঠন
- শিক্ষার্থীদের অনুশীলন
- শিক্ষকের ফলাবর্তন

পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক তাঁর নিজের সুবিধা এবং বিষয়বস্তুর প্রকৃতি বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন কলাকৌশল নির্বাচন করতে পারেন। তবে কলাকৌশল তিনি যা-ই নির্বাচন করুন না কেন, খেয়াল রাখতে হবে যেন ঐ কলাকৌশলের মধ্যদিয়ে উপস্থাপনের প্রতিটি শিরোনামের পূর্বে উল্লিখিত পর্যায়ক্রমের প্রয়োগ হয়।

একটি পাঠের উপস্থাপন অংশকে শিক্ষক শুরুতে কয়েকটি শিরোনামের ভাগ করে নেবেন। যেমন- পাঠটি যদি 'সন্ধি' হয় তবে এর শীর্ষগুলো হতে পারে (১) সন্ধির সংজ্ঞা (২) সন্ধির প্রকার (৩) স্বরসন্ধির অ/আ কার সম্পর্কিত নিয়ম (৪) স্বরসন্ধির ই/ঈ কার সম্পর্কিত নিয়ম- প্রভৃতি।

প্রতিটি শিরোনামে শিক্ষক তার সুবিধামত কলাকৌশল প্রয়োগে নিম্নবর্ণিত কাজগুলো পার্শ্বে উল্লিখিত সময়ের অনুপাত বিবেচনায় রেখে সম্পন্ন করতে পারেন এবং শিক্ষার্থীদের করতে বলতে পারেন।

শীর্ষ- ক : স্বরসন্ধি সাধনের নিয়ম ---------- সময় ২০মি.

কাজের নাম	শিক্ষকের করণীয়	শিক্ষার্থীর করণীয়	সময়
১. উদাহরণ উপস্থাপন	শিরোনাম-সংশ্লিষ্ট কতিপয় উদাহরণ নিজে উল্লেখ করা/ শিক্ষার্থীদের উল্লেখ করতে বলা ও বোর্ডে লিখা।	শিরোনাম-সংশ্লিষ্ট উদাহরণ উল্লেখ করা ও বোর্ডে লিখিত তথ্য খাতায় লেখা।	২ মি.
২. উদাহরণ বিশ্লেষণ	উপস্থাপিত উদাহরণগুলোর স্বরূপ/প্রকৃতি, বোর্ড/পোস্টার পেপারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা।	বিশ্লেষিত স্বরূপ/প্রকৃতি অনুধাবন করা।	৩ মি.
৩. সূত্রগঠন	শিক্ষার্থীদেরকে বিশ্লেষিত স্বরূপ উপলব্ধি করে সংজ্ঞা/সূত্র লিখতে বলা।	সংজ্ঞা/সূত্র খাতায় লেখা।	৪ মি.
৪. শিক্ষার্থীদের অনুশীলন	গৃহীত সিদ্ধান্ত/সূত্র/সংজ্ঞার প্রয়োগমূলক কাজের নির্দেশ প্রদান।	সিদ্ধান্ত/সূত্র/সংজ্ঞার বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগমূলক কাজ দলীয়/একক/জোড়ায় করা।	৮ মি.
৫. শিক্ষকের ফলাবর্তন	শিক্ষার্থীদের অনুশীলনমূলক কাজের ফলাবর্তন প্রদান।	শিক্ষকের ফলাবর্তনের সাথে মিলিয়ে ত্রুটি সংশোধন করে নেওয়া।	৩ মি.

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-কঃ সন্ধির স্বরূপ ও প্রকারভেদ

স্বরসন্ধি	ব্যঞ্জনসন্ধি	বিসর্গ সন্ধি
স্বরধ্বনির সাথে স্বরধ্বনির মিলনের নাম স্বরসন্ধি ।	স্বরধ্বনির সাথে ব্যঞ্জনধ্বনির অথবা ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে ব্যঞ্জনধ্বনির মিলনে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে।	বিসর্গের সাথে স্বরধ্বনির কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির যে সন্ধি হয় তাকে বিসর্গ সন্ধি বলে।
শুভেচ্ছা = শুভ+ইচ্ছা বিদ্যালয় = বিদ্যা+আলয়	দিগন্ত = দিক্+অন্ত উচ্ছ্বাস = উৎ+শ্বাস	নীরব = নিঃ+ রব নমস্কার = নমঃ+কার

পর্ব-খঃ সন্ধি সাধনের নিয়ম

সূত্রভিত্তিক উদাহরণের সম্ভাব্য বিন্যাস নিম্নরূপ হবে-		
স্বরসন্ধি	অ/আ+অ/আ = আ	: দেব+আলয় = দেবালয়
	অ/আ+ই/ঈ = ঈ	: শুভ+ইচ্ছা = শুভেচ্ছা
	অ/আ+উ/ঊ = ও	: সূর্য+উদয় = সূর্যোদয়
	অ/আ+ ঋ = (অর ঁ)	: দেব+ঋষি = দেবর্ষি
	ই/ঈ +ই/ঈ = ঈ	: পরি+ঈক্ষা = পরীক্ষা
ব্যঞ্জনসন্ধি	বর্গের ১ম ধ্বনি + স্বরধ্বনি = বর্গের ৩য় ধ্বনি	: দিক+অন্ত = দিগন্ত
	স্বরধ্বনি+ছ = দ্বিত্ব (চ্ছ)	: পরি+ছদ = পরিচ্ছদ
	ত/দ+ চ/ছ = চ্চ/চ্ছ	: উৎ+ছেদ = উচ্ছেদ
	ত/দ + জ/ঝ = জ্জ/জ্ঝ	: সৎ+জন = সজ্জন
	ম+যরলবশষসহ = ং	: সম্+বাদ = সংবাদ
বিসর্গ সন্ধি	ঃ + ক/খ = স্ক/স্খ/ষ্ক	: নমঃ+কার = নমস্কার
	ঃ + অ = ও	: ততঃ + অধিক = ততোধিক
	ঃ + চ/ছ, ট/ঠ, ত/থ = শিশধ্বনি	: নিঃ+চয় = নিশ্চয়
	ঃ + য/র/ল/ব/হ = ও কার	: মনঃ + হর = মনোহর

ইউনিট -৩ **অধিবেশন -৪**

বাংলা ব্যাকরণ
বাক্যতত্ত্ব : গঠন, অংশবিন্যাস, শ্রেণীবিভাগ ও বাক্য পরিবর্তন কৌশল

ব্যাকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হলো বাক্যতত্ত্ব। ব্যাকরণের সকল উদ্যোগ-আয়োজনই বাক্য তথা বাক্যতত্ত্বকে ঘিরে। একদিক থেকে দেখলে 'বাক্যতত্ত্ব'-ই প্রকৃত ব্যাকরণ। তাই বাক্যতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে একদিকে ভাষা অনুধাবন এবং ব্যবহার যেমন কার্যকর হয় না, তেমনি অন্য দিকে ভাষাশিক্ষাদানেও সাফল্য অর্জন করা যায় না। ব্যাকরণের অন্তিম উদ্দেশ্য অজস্র শুদ্ধ বাক্য অনুধাবন ও উৎপাদন। সেই উৎপাদ-যোগ্য এবং অনুধাবন-যোগ্য বাক্যই বাক্যতত্ত্বে বিশদ ভাবে উন্মোচিত হয়।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- বাক্যতত্ত্বের সংজ্ঞা গঠন করতে পারবেন।
- সার্থক বাক্যের উদাহরণ থেকে এর অংশগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- সার্থক বাক্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করে তার উদাহরণ দিতে পারবেন।
- সার্থক বাক্য গঠনের নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারেন।
- বাক্যের শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ করতে পারবেন ও উদাহরণ সমেত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার বাক্য পরিবর্তন করার কৌশল আয়ত্ত করে ভাষাচর্চায় দক্ষতা অর্জন করবেন।

পর্বসমূহ
পর্ব-ক : বাক্যতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ ধারণার পরিচয়

ক. বাক্যতত্ত্ব : বাংলা ব্যাকরণের যে অংশ বাক্য, বাক্যের সঠিক গঠন, অংশবিন্যাস, বৈশিষ্ট্য, শ্রেণীবিন্যাস, বিশ্লেষণ ও সার্থক ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করে তাকে বাক্যতত্ত্ব বলে। এর প্রধান কাজ হচ্ছে বাক্যে ব্যবহৃত 'উপাদান' (শব্দ/শব্দাংশ, প্রকৃতি-প্রত্যয়, বিভক্তি ইত্যাদি)-এর বিন্যাস নির্দেশ করা। স্বভাবতই, বাক্য সংগঠন এবং বাক্যে ব্যবহৃত উপাদানের ক্রম সংক্রান্ত আলোচনা প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে।

খ. বাক্যঃ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কিছু শব্দ একত্র হয়ে একটি সম্পূর্ণ ও সঙ্গত অর্থ প্রকাশ করলে তাকে বাক্য বলে। যেমন– রহিম বল খেলেছে। বাক্যটিতে মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যদি 'রহিম বল' এটুকু অংশ বলা হত তা হলে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পেত না। খেলে সমাপিকা ক্রিয়া যোগ করায় ভাব ও অর্থ সম্পূর্ণ হল। কিন্তু 'রহিম বল' বাক্যটি যদি এ পর্যন্ত থাকে, তবে তার অর্থ সঙ্গতি হয় না। মানুষ বল হতে পারে না, এটা অর্থ অসঙ্গতি।

গ. বাক্যের গঠন ও বিন্যাস : বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলোকে **'পদ'** বলে। এগুলোতে বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত থাকে।

গ-১ : গঠনের দিক থেকে প্রত্যেক বাক্যের দুইটি অংশ থাকে। (১) উদ্দেশ্য (২) বিধেয়। বাক্যের 'বক্তা' উদ্দেশ্য ও 'সমাপিকা ক্রিয়া' বিধেয় পদ। যেমন- কাক ডাকছে। কাক (কর্তা) উদ্দেশ্য পদ, ডাকছে (সমাপিকা ক্রিয়া) বিধেয় পদ।

গ-২: অর্থের দিক থেকে বিবেচনা করলে বাক্য গঠনের ৩টি বৈশিষ্ট্য লক্ষযোগ্য। এগুলোকে বাক্যের অত্যাবশ্যকীয় গুণ বলে বিবেচনা করা হয়। (১) আকাঙ্ক্ষা (২) যোগ্যতা ও (৩) আসত্তি।

আকাঙ্ক্ষাঃ

বাক্যের অর্থগ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা জন্মে তাকে আকাঙ্ক্ষা বলে। যেমন- 'রহিম বল' এ পর্যন্ত বললে শোনার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না, বাক্যটিও যথাযথ হয় না। রহিম বল খেলে– এই বাক্যে বলের পর খেলে শব্দটি শোনার ইচ্ছাই এখানে 'আকাঙ্ক্ষা'।

যোগ্যতাঃ

বাক্যের অর্থ-বোঝাতে হলে পদগুলোর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ থাকার নামই যোগ্যতা। অর্থাৎ অর্থ প্রকাশক পদ কোনটির সঙ্গে/পরে কোনটি বসার যোগ্যতা তা নির্ধারণ করা। যেমন- রহিম বল খাচ্ছে– বললে কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়াপদ থাকলেও অর্থ সঙ্গতি নেই। এখানে খেলছে পদটিই যথাযথ যোগ্যতাধর্মী পদ।

আসত্তিঃ

অর্থের সঙ্গতি রক্ষা করে পদগুলোকে পরস্পর সুবিন্যাস বা নৈকট্য প্রদান করার নামই আসত্তি। যেমন, 'নাশ্‌তা থেকে উঠে ঘুম খাও' -- এ বাক্যে পদগুলো সুবিন্যস্ত নয় বলে অর্থ সঙ্গতিও নেই। কিন্তু যদি বলা হয়, ঘুম থেকে উঠ নাশ্‌তা খাও, তাহলে পদগুলোর সংস্থাপন সুবিন্যস্ত হয় এবং বাক্যরূপ লাভ করে।

অর্থের দিক থেকে বিবেচনা করেই বাক্য গঠনের এই ৩টি বৈশিষ্ট্য লক্ষযোগ্য। তাই এগুলোকে বাক্যের অত্যাবশ্যকীয় গুণ বলেই বিবেচনা করা হয়।

গ-৩ : বাক্যের গঠন ও বিন্যাস বিচার

বাক্যে ব্যবহৃত উপাদন সকল এলোমেলোভাবে প্রযুক্ত হয় না। শব্দসমূহ বাক্যে ক্রম (order) অনুযায়ী সুশৃঙ্খলভাবে অবস্থান করে। বাংলায় সাধারণত বাক্যের প্রথমে কর্তা (Subject) থাকে, কর্তার পর কর্ম (Object) এবং বাক্যের শেষে ক্রিয়া (Verb) থাকে। উপরের বাক্য বাংলা ভাষায় বাক্যের শব্দক্রমের (word order) উদাহরণ। ভাষাবিজ্ঞানে বাংলাকে বলা হয় S-O-V (Subject-Verb-Object) সংগঠনের ভাষা। বাক্য গঠন করতে হলে পদের ক্রম রক্ষা করে তার যথাযথ প্রয়োগ অপরিহার্য।

পদক্রমের নিয়মাবলি :

বাক্যের অন্তর্ভুক্ত পদগুলো উপযুক্ত স্থানে বসানোই পদ-সংস্থাপন ক্রম। একেই অন্যভাবে পদক্রম বলা হয়।

এক ॥ বাক্যে পদস্থাপনের বা পদক্রমের বেশকিছু নিয়ম আছে।

১। বাক্যের প্রথমে কর্তৃপদ ও সবশেষে সমাপিকা ক্রিয়াপদ বসে। ক্রিয়া সকর্মক হলে, কর্মপদ ক্রিয়াপদের পূর্বে বসে। যেমন- পিতা পুত্রকে তিরস্কার করলেন।

২। দ্বিকর্মক হলে গৌণকর্ম (ব্যক্তিবাচক কর্ম) মুখ্য কর্মের বস্তুবাচক কমের্র আগে বসে। যেমন- তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে।

৩। অসমাপিকা ক্রিয়া সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে এবং সকর্মক হলে তার পূর্বে বসে। যেমন- তিনি এ কথা শুনে বিরক্ত হলেন।

৪। করণ, সম্প্রদান ও অপাদান পদ কখনো কখনো কর্মপদের পূর্বে বসে, পরেও বসে। যেমন- রাখাল বালক লাঠি দিয়ে গরুকে প্রহার করছে। আমি ফুলটি আমার মাকে দিয়েছি।

৫। অধিকরণ পদ অনেক স্থানে কর্তৃপদের পূর্বে, পরে বা ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যেমন- রাজা দুঃখীদেরকে তীর্থক্ষেত্রে অর্থদান করছেন।

৬। পদের সঙ্গে সম্পর্কিত সম্বন্ধপদ তার অব্যবহিত পূর্বে বসে এবং তা সাধারণত 'র' ধ্বনি যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন- রাজার বাড়ি, কুয়ার পানি।

৭। সম্বোধন পদ বাক্যের প্রথমে বা শেষে বসে। যেমন- আল্লাহ্, সৎকাজে যেন আমি কখনো বিরত না হই। তবে কবিতায় এ রীতি সর্বত্র অনুসৃত হয় না।

৮। প্রশ্নবোধক বাক্যে এসব নিয়মের কখনো ব্যতিক্রম হয়ে যায়। যেমন: কে গো তুমি শোনাও গান।

বাক্যে পদ সংস্থাপনের উল্লিখিত ক্রম অনুসরণ করা হলেও এর ব্যতিক্রমও ঘটে। কবিতায় বেশির ভাগ এবং নাটকের অনেক ক্ষেত্রে এ প্রকার ব্যতিক্রম বহুল প্রচলিত। তবে, গদ্যেও সাধারণত দুভাবে পদসংস্থাপন ঘটে থাকে– সম্মুখন এবং পদ-বিপর্যয়।

ক. সম্মুখন : খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায় দুই প্রজন্মের মানুষের মতের ঐক্য।
> দুই প্রজন্মের মানুষের মতের ঐক্য খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

খ. পদ-বিপর্যয় : তাঁর পিতা উগ্রভাবে সমাজদ্রোহী ছিলেন।
> তাঁর পিতা ছিলেন উগ্রভাবে সমাজদ্রোহী।

লক্ষ্যযোগ্য যে, সাধারণ বাক্যের প্রথমে সম্প্রসারকসহ উদ্দেশ্য (বা কর্তা) এবং বাক্যের শেষে সম্প্রসারকসহ বিধেয় (বা ক্রিয়াপদ) বসবে। যেমন -

মনযোগী	ছাত্ররাই	রীতিমত	পড়াশোনা করে।
(সম্প্রসারক)	(কর্তৃপদ)	(সম্প্রসারক)	(ক্রিয়াপদ)

দুই ॥ সম্বোধন পদ বাক্যের প্রথমে বসে : ওহে শফি, কাছে এসো। > **শফি** কাছে এসো > কাছে এসো **শফি**। আবার : শফি, দেখ ! কী কান্ড করেছে সে।

তিন ॥ বিধেয় বিশেষণ সব সময় বিশেষ্যের পরে বসে : লোকটা খুব **ভালো**। তুমি যে **বোকা** এটা তোমার

জানা নেই।

চার ॥ যে সব শব্দ 'আশ্রিত খণ্ডবাক্যের' প্রথমে আছে সেগুলো সাধারণত 'প্রধান খণ্ডবাক্যে'র আগে বসে :

যদি তুমি আসো **তাহলে** আমি যাব। **যখন** তোমায় ডাকলাম **তখন** যে এলে না !

পাঁচ ॥ কিছু শব্দ 'আশ্রিত খণ্ডবাক্যে'র প্রথমে থাকলে সেগুলো 'প্রধান খণ্ডবাক্যে'র পরে বসে : সে জানে না আমি **কখন** যাব। ইরা জানে হীরা **কোথায়** গেছে।

ছয় ॥ উপরের শব্দগুলো আবার আশ্রিত খণ্ডবাক্যের আগে না বসে তার উদ্দেশ্যের পরেও বসতে পারে : আমি দেখতে চাই সে **কীভাবে** কাজটা করে।

সাত ॥ অসমাপিকা ক্রিয়া সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে : আমার বলার কিছু ছিল না। কী জানতে চাও?

আট ॥ বাক্যে না-বোধক অব্যয় বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে : তুই কাজ পারবি **না**, কাজ করিস **নে**। **না** পারলে কেন চেষ্টা করো? দেখো যেন ভুলটা **না** হয়। **বুঝতে না** পারলে আমাকে বলো। **না বুঝতে** পারলে করো না। তুমি **না** বোকা **না** চালাক। আমি **না** আর বলতে পারবো **না**। তুমি এখন বুঝলে **না**? একটু আগে **না** বললে বুঝলে?

এখন আপনি এধরনের আরো কিছু উদাহরণ দিন?

পর্ব-খ : বাক্যের শ্রেণীবিভাগ উদাহরণ ও বিশ্লেষণ

বাক্য বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। সেগুলোকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। বাক্যের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে শিক্ষক যেমন নিজে দক্ষতার সঙ্গে বাক্য ব্যবহার করতে ও বিশ্লেষণ করতে পারেন না, তেমনি শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানেও সফল হতে পারেন না।

বাক্যের শ্রেণীকরণ নানাভাবে হতে পারে বা হওয়া উচিত—এনিয়ে ভাষাবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ করা যায়। তবু, সাধারণভাবে উদ্দেশ্য, অর্থ ও গঠন অনুসারে বাক্যের শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

এক ॥ উদ্দেশ্য বা অর্থানুসারে বাক্য দুই শ্রেণীর

(ক) নির্দেশক বাক্য: যে বাক্যে কোন ঘটনা, অবস্থা বা ভাবের বিবৃতি সাধারণভাবে থাকে তাকে **নির্দেশক বাক্য** বলে। যেমন - সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। নির্দেশক বাক্য আবার দুই রকম, অস্ত্যর্থক বাক্য ও ন্যস্তর্থক বাক্য। **অস্ত্যর্থক বাক্যে** কোন ঘটনা অবস্থা বা ভাব বিবৃতির মাধ্যমে স্বীকৃত বা প্রতিষ্ঠিত হয়।

যেমন— আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

ন্যস্তর্থক বাক্যে কোন ঘটনা, অবস্থা বা ভাব বিবৃতির মাধ্যমে অস্বীকৃত হয়। যেমন— স্বাধীনতার শত্রুরা এদেশে কখনো প্রতিষ্ঠা পাবে না।

(খ) প্রশ্নবোধক বাক্য: যে বাক্য দ্বারা কোন প্রশ্ন করা হয় তাকে **প্রশ্নবোধক বাক্য** বলে। যেমন- তুমি কি মনে কর, মুক্তিযুদ্ধ ভুলে যাবার বিষয়?

এছাড়াও **আবেগসূচক, অনুজ্ঞাবাচক, ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য, কার্যকারণাত্মক বাক্য ও সন্দেহদ্যোতক** নামক বাক্য রয়েছে।

দুই ॥ গঠন অনুসারে বাক্য ৩ প্রকার -

১. সরল বাক্য ২. যৌগিক বাক্য ৩. জটিল বা মিশ্র বাক্য

যে বাক্যে একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাকে **সরল বাক্য** বলে। যেমন- সে স্কুলে গিয়েছে। আজীবন এ কথা মনে রাখব।

যে বাক্যে পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা তার চেয়ে বেশি বাক্য, কোন সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হয়, তাকে **যৌগিক বাক্য** বলে। যেমন- সে স্কুলে গিয়েছে এবং আমি বেড়াতে গেলাম। তোমার পড়াশোনায় লেগে থাকতে হবে, তবেই পরীক্ষায় ভাল করতে পারবে।

যে বাক্যে একটি প্রধান বাক্যাংশ এবং এক বা একাধিক অঙ্গীভূত অপ্রধান বাক্যাংশ থাকে তাকে **জটিল** বা **মিশ্র বাক্য** বলে, যেমন - যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে।

এছাড়াও **বিশেষ্য স্থানীয় নাম বিশেষণীয় ও ভাব বিশেষণীয় বাক্য** রয়েছে।

তিন ॥ বাক্যের বৈশিষ্ট্য -

ক. সরল বাক্য - একটি কর্তা (উদ্দেশ) ও একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে।

খ. জটিল বা মিশ্র বাক্য - একটি প্রধান বাক্যাংশ থাকে।

- এক বা একাধিক অঙ্গীভূত প্রধান বাক্যাংশ থাকে।
- একটি বাক্য ছাড়া অন্যটির অর্থবোধ জন্মায় না।

গ. যৌগিক বাক্য – পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা তার বেশি বাক্য দিয়ে গঠিত।

- সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয় থাকবে।
- অব্যয় দিয়ে বাক্যগুলো যুক্ত থাকবে।

উদাহরণ : সরল বাক্য – পাখি আকাশে ওড়ে।
(উদ্দেশ্য) (বিধেয়)

জটিল বা মিশ্র বাক্য– যে এখানে এসেছিল, সে আমার বন্ধু।
যে পরিশ্রম করে, সে নিশ্চয়ই সুখ লাভ করে।
(পরাধীন অংশ) (প্রধান অংশ)

যৌগিক বাক্য– চুপ করে শোনো, নতুবা চলে যাও।
আমি মরবো, তবু দয়া ভিক্ষা করবো না।
যদি বারণ কর, তবে গাহিব না।
(সংযোজক অব্যয়)

''অন্তঃপুরে মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মঙ্গল আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।" (রবীন্দ্রনাথ, কাবুলীওয়ালা)

এই পর্যায়ে আপনি সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্যের উদাহরণ দ্বারা কয়েকটি নির্দেশক ও প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরি করতে পারবেন কি?

পর্ব-গ : বাক্যের রূপান্তর : এক শ্রেণীর বাক্য থেকে অন্য শ্রেণীর বাক্যে পরিবর্তন

বাক্যের রূপান্তর বা পরিবর্তন কী তা ভাল করে বুঝে নেয়া দরকার। বাক্যের রূপান্তর হলো : এক শ্রেণীর বাক্যকে অন্য শ্রেণীতে পরিবর্তন করা। এর মাধ্যমে ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়। এতে বাক্য সংশ্লেষণ ও সংযোজন প্রক্রিয়ায়, ভাষার অর্থ দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনা বৃদ্ধি পায়। নিচের উদাহরণগুলো থেকে ব্যাপারটি বোঝা যাবে।

বাক্যের রূপান্তর প্রক্রিয়ার উদাহরণঃ

সরল বাক্য	জটিল বাক্য	যৌগিক বাক্য
১. তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।	১. তুমি মনে মনে যে কামনা করেছ তা পূর্ণ হোক।	১. তুমি মনে মনে প্রার্থনা করলে এবং সব আমাকে খুলে বললে।
২. বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও এ কাজ করবে না।	২. যার বুদ্ধি আছে সে কখনো এ কাজ করবে না।	২. সে বুদ্ধিমান বটে, তবে সে সুখী নয়।
৩. সত্যকথা বলাতে তুমি নিষ্কৃতি পেলে।	৩. যার সততা আছে সে কখনো শাস্তি পাবেনা।	৩. তুমি সত্য কথা বলেছ এজন্য নিষ্কৃতি পেলে।
৪. তিনি বিদ্বান হলেও কাণ্ডজ্ঞান শূন্য।	৪. তার বিদ্যা আছে, শুধু কাণ্ডজ্ঞান শিখতে হবে।	৪. তিনি বিদ্বান কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান হীন।

সরল বাক্য যোগে গঠিত অনুচ্ছেদ

একজন শিক্ষকের একটি বিদ্যালয় ছিল। বিদ্যালয়টি তাঁর নিজের তত্ত্বাবধানে ছিল। তিনি তাঁর ক্লাস নিজে নিতেন না। অন্য শিক্ষকদেরকে তাদের ইচ্ছানুযায়ী ক্লাস করতে দিয়েছিলেন। তাতে বিদ্যালয়ের সুনাম দিন দিন খারাপ হতে লাগল। বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা শূন্যে এসে দাঁড়াল। অবশেষে তিনি ঋণগ্রস্ত হলেন। তখন তিনি বিদ্যালয়টি বাজার কমিটির কাছে বন্ধক রাখলেন।

জটিল বাক্য যোগে গঠিত অনুচ্ছেদ

আমার স্মরণ আছে, এ স্থানে আমি সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে ক্লান্ত হলে, আপনি আপনার হাতের তালের বৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধারণ করে, উত্তাপ নিবারণ করেছিলেন।

যৌগিক বাক্যে পরিণত করে গঠিত অনুচ্ছেদ

একজন শিক্ষক নিজের তত্ত্বাবধানে একটি বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষকতার কাজ নিজে না করে অন্যান্য শিক্ষককে, তাদের ইচ্ছামত ক্লাস করতে দিয়েছিলেন। সুতরাং বিদ্যালয়ের মান দিন দিন খারাপ হয়ে ছাত্রসংখ্যা শূন্যে নেমে এসেছিল এবং তিনি অবশেষে ঋণগ্রস্ত হয়ে, বিদ্যালয়টি বাজার কমিটির নিকট বন্ধক রাখলেন।

যৌগিক বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিবর্তন :

যৌগিক বাক্য : তাঁর অনেক বিদ্যা ও গুণ আছে, জাহির করেন না।
ছেলেটি দেখতে সুদর্শন, কিন্তু কাজকর্মে অপদার্থ।

জটিল বাক্য : *যদিও তাঁর অনেক গুণ আছে কিন্তু তিনি তা জাহির করেন না।*
ছেলেটি দেখতে সুদর্শন হলে কি হবে কাজকর্মে একেবারে অপদার্থ।

একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে যে, বাক্য পরিবর্তনে প্রয়োজন হয় শব্দের পরিবর্তন এবং কখনো বা নতুন শব্দ যোগকরা বা বর্জনকরা। আর যেসব উপায়ে বাক্য পরিবর্তন করা যায় তার মধ্যে অন্যতম হলো: বাক্যকে সংকোচিত করা, সম্প্রসারিত করা এবং বাক্যের গঠনগত পরিবর্তন করা।

এই সঙ্গে বলা যায় যে, উপরের তিন উপায়ের মধ্যেও আবার সূক্ষ্ম অর্থে আরো কয়েকটি উপ-কৌশলেও বাক্যকে পরিবর্তিত করা যেতে পারে, যেমন– কৃৎ প্রত্যয়যোগে : জন্ম থেকে যে অন্ধ = জন্মান্ধ, তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে : হেমন্তের যে ফসল = হৈমন্তি, সমাসবদ্ধ শব্দ যোগে : কূলের সমীপে=উপকূল, ভিন্ন শব্দের প্রয়োগে : বাদশাহী নির্দেশনামা = ফরমান ইত্যাদি।

আপনার ভাষাজ্ঞান থেকে বাংলার আর কী-কী ধরনের বাক্যের উদাহরণ উল্লেখ করা যায় যেগুলোর একটি থেকে অন্যটিতে রূপান্তর করা যেতে পারে?

ইউনিট ৩ **অধিবেশন ৪**

মূল শিখনীয় বিষয়

বাক্যতত্ত্ব : গঠন, অংশবিন্যাস, শ্রেণীবিভাগ ও বাক্য পরিবর্তন কৌশল

ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে হলে এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশিত-রূপ তথা ভাষার বৃহত্তম/অন্তিম যে একক বাক্য, সে সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিক ধারণা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এর জন্য বাক্যের যে দিকগুলো জরুরি সেগুলো এই অধিবেশনে তুলে ধরা হয়েছে।

গঠন : সুগঠিত বাক্য ছাড়া ভাষা-প্রকাশ যথার্থ হয় না। পৃথিবীর সকল ভাষার বাক্যের মতই বাংলা বাক্য প্রধান দুটি অংশ নিয়ে গঠিত– উদ্দেশ্য ও বিধেয়; প্রথম অংশে কর্তা (Subject) এবং দ্বিতীয় অংশে কর্ম (Object) ও ক্রিয়া (Verb) থাকে। এই বিচারে বাংলা বাক্যের গঠন S-V-O।

অংশ বিন্যাস : বাংলা বাক্যের গঠনে পদ-সংস্থাপনে এই ক্রম সাধারণ হলেও ভাষার কারুকাজ, বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য বর্ধনে এবং বিশেষ করে কবিতা ও নাটকে এর সুপ্রচুর ব্যতিক্রম ঘটে। বাক্যের অংশকে নানাভাবেই বিন্যস্ত করা যায়; অন্যতম হলো : সম্মুখন ও পদ-বিপর্যয় কৌশল। এক পদ-বিপর্যয়ই কম করে ১২ রকম হতে পারে, আবার সেগুলোর মধ্যে শুধু 'না/নে' অব্যয়ই ৮ রকম ভাবে বিন্যস্ত হয়। তবে বাক্যের অংশ-বিন্যাসে কিছু সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করতেই হয়।

শ্রেণী বিভাগ : বাক্য-সৌকর্য আয়ত্ত করার জন্য এর শ্রেণী বিভাগ অনুধাবন অত্যাবশ্যক। উদ্দেশ্য, অর্থ ও গঠন অনুসারে বাক্যের শ্রেণী বিভাগ হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য বা অর্থানুসারে বাক্য– নির্দেশক ও প্রশ্নবোধক হয়। নির্দেশক– সূর্য পশ্চিমে অস্ত যায়। নির্দেশক বাক্য দুই রকমের– অস্ত্যর্থক ও ন্যস্তর্থক বাক্য। অস্ত্যর্থকে - কোনো কিছু বিবৃতির মাধ্যমে স্বীকৃত বা প্রতিষ্ঠিত বোঝায়, যেমন– আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। ন্যস্তর্থক বাক্যে বিবৃতির মাধ্যমে কিছু অস্বীকৃত হয়। যেমন– অপরাধী কখনো পার পাবে না। প্রশ্নবোধক– এতে কোনো প্রশ্ন করা হয়, যেমন– মুক্তিযুদ্ধ কি ভুলে যাবার বিষয়?

এছাড়া আবেগসূচক, অনুজ্ঞাবাচক, ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক, কার্যাকারণাত্মক এবং সন্দেহদ্যোতক বাক্যও রয়েছে।

গঠন অনুসারে বাক্য ৩ প্রকার– সরল বাক্য, জটিল বা মিশ্রবাক্য ও যৌগিক বাক্য। সরল– ছেলেরা স্কুলে যায়। জটিল– যদি বারণ কর, তবে গাহিব না। যৌগিক– আমি মরবো, তবু করুণা ভিক্ষা করবো না।

বাক্য পরিবর্তন : ভাষা ব্যবহারের দক্ষতার জন্য বাক্য পরিবর্তন কৌশল আয়ত্ত করতে হয়। এতে এক শ্রেণীর বাক্যকে অন্য শ্রেণীতে পরিবর্তিত করতে হয়, যাতে বাক্য সংশ্লেষণ ও সংযোজন প্রক্রিয়ায় ভাষার অর্থ দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনা বৃদ্ধি পায়। বাক্য পরিবর্তনও নানাভাবে হতে পারে। সরল থেকে জটিল : ধার্মিকেরা সুখী > যারা ধার্মিক তাঁরা সুখী। জটিল থেকে সরল :

ছেলেটি গরীব কিন্তু মেধাবী > গরীব ছেলেটি মেধাবী। সরল থেকে যৌগিক : দশ মিনিট পর ট্রেন এলো > দশ মিনিট পার হলো এবং ট্রেন এলো। যৌগিক থেকে সরল : হয় কাজ কর, নয় বসে পড়ো > কাজ না করলে বসে পড়ো। জটিল থেকে যৌগিক : যদিও তিনি ধনী, তথাপি তিনি অসুখী > তিনি ধনী বটে, কিন্তু অসুখী। যৌগিক থেকে জটিল : সে কাল আসবে এবং আমি যাব > যদি সে কাল আসে, তবে আমি যাব। এগুলো ছাড়াও অস্তিবাচক-নেতিবাচক ভিত্তিতে যেমন পারস্পরিক বাক্য-পরিবর্তন সম্ভব, তেমনি অন্যান্য শ্রেণীর বাক্যও পরিবর্তন সম্ভব। বাক্য পরিবর্তনের উপায় হিসেবে (ক) বাক্য-সংকোচন (খ) বাক্যের সম্প্রসারণ এবং (গ) বাক্যের গঠনগত পরিবর্তন করা যেতে পারে।

মূল্যায়নঃ

১। বাক্যতত্ত্ব বলতে বাক্যের কোন-কোন দিক আলোচনায় আসে? সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

২। বাক্যের গঠন কী-কীভাবে বিবেচনা করা হয়? বাক্য গঠনে কোন-কোন বিশেষ দিকের উপর খেয়াল রাখতে হয়?

৩। বাংলা বাক্য সাধারণত কয় শ্রেণীর হতে পারে? কিসের উপর ভিত্তি করে শ্রেণী-উপশ্রেণী বিভাজন করা যায়? উদাহরণ দিন।

৪। বিভিন্ন প্রকার বাক্যের রূপান্তর কীভাবে করা যায়? প্রধান কয়টির উদাহরণ দিন।

সম্ভাব্য উত্তর :

পর্ব-ক :

সম্মুখন - নানা পণ্ডিত বাক্য সম্পর্কে নানা মত দেন। > **বাক্য সম্পর্কে** নানা পণ্ডিত নানা মত দেন। পদ-বিপর্যয় - এসব আলোচনার আসল কথা নয়। > আলোচনার আসল কথা **এসব** নয়। আশ্রিত খণ্ডবাক্যে সম্পর্কযুক্ত পদের ব্যবহার - **যেই** ফড়িংটা ধরতে গেলাম **অমনি** তা উড়ে গেল। নিত্য সম্বন্ধযুক্ত পদের ব্যবহার - **যেমন** কর্ম **তেমন** ফল। বিকল্প বোঝাতে 'না' ব্যবহার - বলতে **না** চাও, কিছুটা আভাস দাও।

পর্ব-খ :

নির্দেশক : সরল বাক্য – ছেলেরা এখন ক্লাশে যাও।
জটিল বাক্য – যে কাজটি করতে চাও, সে কাজটি করে ফেল।
যৌগিক বাক্য – ভালো করে কাজ করো, নতুবা চলে যাও।

প্রশ্নবোধক : সরল বাক্য – তুমি কি যাবে?
জটিল বাক্য – অন্য সবাই যদি যায়, তুমি কি যাবে?
যৌগিক বাক্য – মন দিয়ে পড়াশোনা করবে, নাকি এমনি করে আড্ডা মেরে হল্লা করেই সময় নষ্ট করে যেতে থাকবে?

পর্ব-গ :

ক. অস্তিবাচক খ. নেতিবাচক গ. অনুজ্ঞাসূচক ঘ. প্রার্থনাসূচক ঙ. বিস্ময়সূচক ছ. সংশয়াত্মক জ. উক্তির পরিবর্তনগত (প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ)

ইউনিট -৩ **অধিবেশন ৫**

সাধু ও চলিত ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য : প্রমিত চলিতরীতির অনুশীলন

ভাষা মূলত দুভাবে ব্যবহৃত হয়- মৌখিক এবং লিখিত। মুখের ভাষা অস্থায়ী, লেখার ভাষা স্থায়ী। মুখের ভাষা বাচন নির্ভর, তাই অঞ্চলভেদে বিভিন্ন। মনের কথাকে শুধু মুখে প্রকাশ করে নয়, লিপির মাধ্যমে স্থায়ী রূপ দেবার লক্ষ্যে একটি সর্বজনগ্রাহ্য মার্জিত রূপের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই উদ্দেশ্যেই ভাষার লিখিত রূপের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে।

ভাষার মৌখিক রূপটিকে চলিত এবং লিখিত রূপটিকে সাধু বলে অভিহিত করার প্রবণতা বহু পুরাতন। কিন্তু সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে এ ধারণা আজ বদলে যাচ্ছে। কারণ বাংলা গদ্যের লিখিত রূপে এখন সাধু এবং চলিত রূপের সহাবস্থান চলছে। ভবিষ্যতে হয়তো একদিন চলিত রীতিই লেখ্য ভাষার মূল অবলম্বন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।

ভাষা শিক্ষককে সাধু ও চলিত এই দু'রীতির বৈশিষ্ট্য ও গতিধারা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। সাধুভাষায় রচিত সম্পদ তাকে বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ করবে। অন্যদিকে প্রতিদিনের পাঠদানের কাজে চলিত রীতির সুষ্ঠু ব্যবহার পাঠকে শক্তি ও গতি দান করবে। তাই উভয় রীতির সম্যক উপলব্ধির জন্য তার সযত্ন অনুশীলন প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- বাংলা সাধুভাষার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- বাংলা চলিতভাষার স্বরূপ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- সকল ক্ষেত্রে চলিতভাষা ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির কৌশল শনাক্ত করতে পারবেন।
- শ্রেণীকক্ষে বাংলা সাধু ও চলিত ভাষারীতি পঠন-পাঠনের পদ্ধতি ও কলাকৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : বাংলা সাধু ভাষারীতি

উনিশ শতকে বাংলা ভাষার যে লিখিত রূপ গড়ে ওঠে তার নাম দেওয়া হয় 'সাধুভাষা'। সংস্কৃত বুৎপত্তিসম্পন্ন মানুষের ভাষাকে 'সাধুভাষা' বলে অভিহিত করেন রাজা রামমোহন রায়। সে সময়ের অনেক সাহিত্যিক এই সাধুভাষায় তাদের সাহিত্যকীর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। সাহিত্যিক এই সাধুভাষায় সংস্কৃত শব্দের পাশাপাশি অসংস্কৃত শব্দও অনেক ব্যবহৃত হয়েছে। তবে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হচ্ছে অসমাপিকা, সমাপিকা ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের বিস্তৃত রূপ। যেমন- দেখিয়া, যাইতেছে, তাহার প্রভৃতি। এ ছাড়া যুক্তাক্ষরযুক্ত ও সমাসবদ্ধ শব্দেরও বিশেষ রীতিসিদ্ধ ব্যবহারও এ ভাষারূপে লক্ষণীয়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদ দু'টি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং এগুলোর নিচে বিবৃত সাধু ভাষারীতির প্রতিটি দিকের দু'টি করে উদাহরণ নির্বাচন করে পাশে লিখুন।

''বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করিয়া একটা নতুন ভাবোদয় হইল। নদীর ধারে একটা প্রকান্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়াছিল; স্থির হইল, সেইটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

যে ব্যক্তির কাষ্ঠ, আবশ্যককালে তাহার যে কতখানি বিস্ময়, বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে, তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।"

তৎসম শব্দ -

সমাসবদ্ধ শব্দ -

যুক্তাক্ষরযুক্ত শব্দ -

সমাপিকা ক্রিয়া -

অসমাপিকা ক্রিয়া -

সর্বনাম পদ -

বিশেষণ পদ -

বিশেষ্য পদ -

'ল' ধাতুজাত ক্রিয়া-

জটিল বাক্য -

প্রিয় শিক্ষার্থী, এই পাঠ শেষে উপর্যুক্ত কাজের সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। প্রদত্ত উত্তরের সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন এবং পরে উদাহরণগুলোর বিবেচনায় বাংলা সাধু ভাষারীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিজ নিজ খাতায় পর্যায়ক্রমে লিখুন।

পর্ব-খঃ বাংলা চলিত ভাষারীতি

পূর্বে সংস্কৃতবহুল 'সাধুভাষার' বহুল প্রচলনের ফলে বাংলা গদ্য নিছক পণ্ডিতি গদ্যে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে এর গতিশক্তি শিথিল ও মন্থর হতে থাকে। তাই সে যুগের কোন কোন গদ্যশিল্পী এই পণ্ডিতি গদ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আপামর জনতার 'কথ্যভাষা'র ঢঙে বাংলা গদ্য রচনায় ব্রতী হন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হওয়া ভাষার এই নতুন রূপের নামই 'চলিত রীতি' বা 'চলিত ভাষা'।

ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী স্থানের ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের ব্যবহৃত মৌখিক ভাষা, সমগ্র বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক শ্রেষ্ঠ মৌখিক ভাষা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই মৌখিক ভাষাকে বিশেষভাবে 'চলিত ভাষা' বলা হয়"।

চলিত ভাষায় মানুষের মুখের ভাষার মার্জিত রূপকে সহজ, সরল ও চটুল ভাবে প্রকাশ করা হয় এবং ক্রিয়া, সর্বনাম ও নঞর্থক অব্যয় পদের সংক্ষিপ্তরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: 'যাকে তাকে যা তা তোমার শেখাতে যাওয়া উচিত হয়নি'।

সে যা হোক, আসুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলিত ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য প্রথমে আমরা পর্ব ক -এর অনুচ্ছেদটিকে চলিতরীতিতে রূপান্তর করে নিচের ফাঁকাস্থানে লিখি। পরবর্তীকালে এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা চলিত ভাষারীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করি এবং পাঠশেষে প্রদত্ত সম্ভাব্য উত্তর ও মূল শিখনীয় বিষয়ের সাথে মিলিয়ে ত্রুটি সংশোধন করি ।

সম্ভাব্য রূপান্তর:

চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য:

পর্ব-গ: চলিত ভাষারীতির ব্যবহার দক্ষতা

যে কোন ভাষায় দক্ষতা অর্জন ব্যবহার সাপেক্ষ। ভাষার ব্যবহার যত বহুমাত্রিক হবে তার উপর দক্ষতা তত বেশি অর্জিত হবে। তাই বাংলা চলিত ভাষারীতির সম্যক উপলব্ধি ও তার সার্থক প্রয়োগের জন্যও এর ব্যবহারিক দিকের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন ধরনের মৌখিক ও লৈখিক অনুশীলনের আয়োজন করা সহ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, প্রথমে নিজস্ব চিন্তার প্রয়োগে নিচের ছকে বিভিন্ন ধরনের মৌখিক ও লৈখিক অনুশীলনের ক্ষেত্র ও কলাকৌশলসমূহ উল্লেখ করুন। পরে আপনার উত্তর মূল শিখনীয় বিষয়ের সংশ্লিষ্ট অংশের সাথে মিলিয়ে সংশোধন করে নিন।

মৌখিক অনুশীলনের ক্ষেত্র:	লৈখিক অনুশীলনের ক্ষেত্র:
কলাকৌশলসমূহ:	

পর্ব-ঘ : সাধু ও চলিত ভাষারীতির পঠন-পাঠন

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে, শ্রেণীতে ব্যাকরণ পঠন পাঠনের দীর্ঘ দিনের বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে- আরোহ, অবরোহ এবং আরোহ-অবরোহ পদ্ধতি। এই তিনটি পদ্ধতি মূলত সূত্র ও উদাহরণের পর্যায়ক্রমিক উপস্থাপন সংশ্লিষ্ট। পাঠদানের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত পদ্ধতিসমূহের গ্রহণযোগ্যতা কোনদিনই কমবে না। তবে ভাষা পাঠদানকে আরো কার্যকর, অংশগ্রহণমূলক ও অর্থপূর্ণ করার জন্য উপর্যুক্ত পদ্ধতিসমূহের সাথে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিসমূহের বিভিন্ন কলাকৌশলের সমন্বয় সাধন করা যায়। যেমন শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক সাধু ও চলিত ভাষারীতির পঠন-পাঠন পাঠদানের উপস্থাপন অংশের একটি শীর্ষের নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করতে পারেন-- যার প্রয়োগ এই মডিউলের ইউনিট ৩, অধিবেশন ২ এর সন্ধি পাঠদানের ক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে। প্রিয় শিক্ষার্থী, কাজগুলো এখানে পর্যায়ক্রমিকভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয় নি। দেখা যাক আপনি নিজে চিন্তা করে পর্যায়ক্রমিকভাবে সাজাতে পারেন কি না।

উদাহরণ বিশ্লেষণ	১.
সূত্রগঠন	২.
শিক্ষার্থীর অনুশীলন	৩.
ফলাবর্তন	৪.
উদাহরণ উপস্থাপন	৫.

শ্রেণীতে পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েরই সুনির্দিষ্ট কিছু করণীয় রয়েছে। যেমন উপরে বর্ণিত কার্যক্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষকের মূল কাজ হচ্ছে নির্দেশনা দেওয়া ও কাজে সহযোগিতা করা। আর শিক্ষার্থীর কাজ হচ্ছে শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহযোগিতা চাওয়া। কিন্তু শিক্ষক কীভাবে নির্দেশনা দিবেন, কীভাবে উদাহরণ উপস্থাপন করবেন, কীভাবে উদাহরণ বিশ্লেষণ করবেন, কীভাবে ফলাবর্তন দিবেন– সে সবও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আসুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা সে সব বিবেচনা মাথায় রেখে সাধু ও চলিত ভাষারীতির পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে শ্রেণীতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর করণীয় সম্পর্কিত তথ্য দিয়ে

নিচের ছকটি পূরণ করি এবং পরে মূল শিখনীয় বিষয়ের সংশ্লিষ্ট অংশের সাথে মিলিয়ে নিজ নিজ উত্তরের যথার্থতা যাচাই করি।

কৌশলের নাম	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ
পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ:		
পোস্টার উপস্থাপন:		
মিলকরণ:		
বৈষম্য অনুসন্ধান:		
ত্রুটি শনাক্তকরণ:		
তালিকা প্রস্তুতকরণ:		
ব্লাকবোর্ড সারসংক্ষেপ:		
তথ্যছক তৈরি:		

ইউনিট ৩ **অধিবেশন ৫**

মূল শিখনীয় বিষয়

সাধু ও চলিত ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য : প্রমিত চলিতরীতির অনুশীলন

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে লেখার ভাষার কম বেশি পার্থক্য ঘটে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি প্রযোজ্য। এ ভাষার লিখিত(সাধু রীতি) ও মৌখিক রূপে (চলিত রীতি) বিভিন্ন দিকের ভিত্তিতে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

ধরন/চাল: সাধুভাষা কৃত্রিম, গুরুগম্ভীর এবং পোশাকী ভাষা; অন্যদিকে চলিতভাষা অকৃত্রিম, হাল্‌কা চালের এবং আটপৌরে ভাষা।

ব্যবহার: সাধুভাষা সাধুজনের মুখে ব্যবহৃত ভাষা। এটি লিখিত রূপের ভাষা বলে চিরকালের প্রয়োজন মেটায়। চলিতভাষা মৌখিক রূপের ভাষা বলে ক্ষণকালের প্রয়োজন মেটায়।

শব্দরূপ: সাধুভাষায় তৎসম, সমাসবদ্ধ ও যুক্তাক্ষরযুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়। চলিতভাষায় তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, গ্রাম্য ও আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহৃত হয়।

পদরূপ: সাধুভাষায় পদের বিস্তৃতরূপ বসে; চলিতভাষায় সংক্ষিপ্ত ও স্বতন্ত্র রূপ বসে। যেমন: করিয়া- করে, তদনুরূপ- সেই মতো, উপস্থিত- হাজির, তথাপি- তবু।

বাক্য গঠন: সাধুরীতিতে বাক্য-গঠন রীতি সুনির্দিষ্ট। এতে বড় ও জটিল বাক্য বসে। চলিত ভাষায় বাক্য-গঠন রীতি অনির্দিষ্ট। এতে ছোট, সরল ও যৌগিক বাক্য বসে।

ধাতুরূপ: উভয় ভাষায় ধাতুরূপেও রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। যেমন: সাধুভাষায় 'ল' ধাতু রূপটি চলতিভাষায় 'ন' ধাতু রূপে রূপান্তরিত হয়। লয়- নেয়, লইবে-নিবে, লইলে-নিলে।

গতিময়তা: ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়ম সাধুভাষায় অনুসৃত হয় না বলে এটি স্থবির ভাষা, পুকুর বা দীঘির সাথে তুলনীয়। অন্যদিকে চলিতভাষা ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়ম মেনে নিত্য রূপান্তরিত হয় বলে এটি ঝর্ণার মতো চলিষ্ণু ভাষা।

বয়স: সাধুভাষা পুরোনো ভাষা। রামমোহন, বিদ্যাসাগর যুগে এটি পূর্ণতা পেয়েছে। চলিত ভাষা অপেক্ষাকৃত নতুন ভাষা। প্রমথ চৌধুরীর সময়ে তথা ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি এসে এটি স্ফুর্তি লাভের পথে অগ্রসর হয়েছে।

শিল্প রস: সাধুভাষা কৃত্রিম বলেই গল্প, কবিতা, উপন্যাসে এটি শিল্পরস সৃষ্টিতে সর্বত্র সার্থক নয়। কিন্তু চলিতভাষা অকৃত্রিম, তাই শিল্পরস সৃষ্টির সহায়ক।

সংহতি রক্ষা: সাধুভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য নেই; তাই সারা দেশের সংহতি রক্ষা করতে পারে। কিন্তু চলিতভাষা একেক অঞ্চলে একক রকম বলে দেশের সংহতি রক্ষা করতে পারে না।

অভিযোজন: সাধুভাষা অন্য ভাষার শব্দকে নিজের করে নিতে পারে না। কিন্তু চলিতভাষা অন্য যে কোন ভাষার শব্দ গ্রহণ করতে পারে।

দক্ষতা অর্জন: সাধুভাষার ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন শিক্ষা সাপেক্ষ। কিন্তু চলিত ভাষায় দক্ষতা অর্জন ব্যবহার সাপেক্ষ।

সাধু ভাষার উদাহরণ :

"তাহার ঘরে গেলাম। সে আমাকে ক্ষুধাতুরা দেখিয়া গাইটি দুহিয়া একটু দুধ খাইতে দিল। সে মহেশপুর চিনিত। তাহাকে আমি বলিলাম যে, 'তোমাকে টাকা দেওয়াইব– তুমি আমাকে সেখানে রাখিয়া আইস।' তাহাতে সে কহিল যে, 'আমার ঘর সংসার ফেলিয়া যাইব কি প্রকারে? তখন সে যে পথ বলিয়া দিল, আমি সেই পথে গেলাম।"

"বাল্যকালের দিকে যখন তাকাইয়া দেখি, তখন সকলের চেয়ে স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে তখনকার বর্ষার দিনগুলি। বাতাসের বেগে জলের ছাঁটে বারান্দা একেবারে ভাসিয়া যাইতেছে। সারি সারি ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ হইয়াছে।"

চলিত ভাষার উদাহরণ :

"কেউ হয়তো প্রথমেই জিজ্ঞাসা করতে পারেন, বাংলা ভাষা কাকে বলে? বাঙালীর মুখে এ প্রশ্ন শোভা পায় না। এ প্রশ্নের সহজ উত্তর কি এই নয় যে, যে ভাষা আমরা সবাই জানি, শুনি ও বুঝি, যে ভাষায় আমরা ভাবনা-চিন্তা, সুখ-দুঃখ, বিনা আয়াশে, বিনা ক্লেশে, বহুকাল হতে প্রকাশ করে আসছি এবং সম্ভবত আরও বহুকাল পর্যন্ত প্রকাশ করব, সে ভাষাই আমাদের প্রাণের ভাষা, আমাদের বাংলা ভাষা।"

"স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে যখন শুনতে পেতাম, " বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর," অথবা "মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি, মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে অস্ত্র ধরি", তখন আমরাও যুদ্ধের মন্ত্রে উদ্দীপিত হয়ে সমস্বরে গেয়ে উঠতাম, "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।"

চলিতরীতি ব্যবহারের দক্ষতাবৃদ্ধির কৌশল : মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদেরকে মুখের কথায় ও লেখার ভাষায় চলিতরীতি ব্যবহারে পারঙ্গম করে তোলার জন্য শিক্ষক নিম্নবর্ণিত কৌশলসমূহ প্রয়োগ করতে পারেন।

- মৌখিক অনুশীলন : বক্তৃতা, গল্প বলা, আবৃত্তি, অনুষ্ঠান পরিচালনা।
- লৈখিক অনুশীলন : রচনা, ভাব-সম্প্রসারণ, সারাংশ, কথিকা, দেয়াল পত্রিকা প্রভৃতির অনুশীলন করানো।
- শ্রুতলিপির অনুশীলন।
- শ্রেণীতে চলিত রীতিতে কথোপকথন।
- আদর্শ ও সরব পাঠকে প্রাধান্য দেওয়া ।
- আলাদা করে উচ্চারণ শেখানো।
- ব্যাকরণের বিভিন্ন দিকের যথার্থ অনুশীলন : যেমন- শব্দরূপ, পদরূপ, বাক্যরূপ, ধাতুরূপ প্রভৃতি।
- চলিত রীতি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান।
- উভয় রীতির মৌল-পার্থক্য বিশ্লেষণ।
- ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা।
- শিক্ষার্থীদের ভাষা-রীতির মিশ্রণজনিত ত্রুটি নিষ্ঠার সাথে সংশোধন করে দেওয়া।

সাধু ও চলিত ভাষারীতির পঠন-পাঠন : শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে সাধু ও চলিত ভাষারীতি পাঠদানের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির নিম্ন-বর্ণিত কৌশলসমূহ প্রয়োগ করতে পারেন। মনে রাখতে হবে এসব কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কাজই বেশি। শিক্ষক কেবল শিক্ষার্থীদের কাজের তদারকি করবেন, প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেবেন এবং কাজের প্রতিটি অংশের আবশ্যক ফলাবর্তন দেবেন।

• পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ	• ত্রুটি শনাক্তকরণ
• পোস্টার উপস্থাপন	• তালিকা প্রস্তুতকরণ
• মিলকরণ	• ব্লাকবোর্ড সার-সংক্ষেপ
• বৈষম্য অনুসন্ধান	• তথ্যছক তৈরি .....প্রভৃতি

সম্ভাব্য উত্তর :

পর্ব-ক- সাধুভাষার বৈশিষ্ট্য

তৎসম শব্দ - স্থির সমাসবদ্ধ শব্দ - ভাবোদয়

যুক্তাক্ষরযুক্ত শব্দ - প্রকাণ্ড সমাপিকা ক্রিয়া - করিল

অসমাপিকা ক্রিয়া - করিয়া সর্বনাম পদ - তাহার

বিশেষণ পদ - প্রকাণ্ড

বিশেষ্য পদ - কাষ্ঠ

ল ধাতুজাত ক্রিয়া- লইয়া

জটিল/দীর্ঘ বাক্য - যে ব্যক্তির কাষ্ঠ, আবশ্যককালে তাহার যে কতখানি বিস্ময় বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে, তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।

সাধু ভাষারীতি কৃত্রিম, গুরুগম্ভীর ও পোশাকী ভাষা।

- লিখিতরূপে এর ব্যবহার বেশি।
- এর বাক্য গঠনরীতি সুনির্দিষ্ট।
- এ ভাষার ধ্বনি অপরিবর্তনীয়; তাই এ ভাষারূপ অনেকটা বদ্ধ পুকুর বা দীঘি মত স্থবির। এ ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য নেই।

এ ভাষার অভিযোজন ক্ষমতা কম। অন্যভাষার শব্দকে এ ভাষারীতি সহজে নিজের করে নিতে পারে না।

পর্ব খ- বাংলা চলিত ভাষারীতি

ছেলেদের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করে একটি নতুন ভাব জেগে উঠল। নদীর ধারে একটি বড় শালকাঠ মাস্তুল বানানোর জন্য রাখা ছিল। ঠিক হলো, সেটা সবাই মিলে গড়িয়ে নিয়ে যাবে।

যার কাঠ, প্রয়োজনের সময় তার খুব অসুবিধে হবে। সে বিস্মিত ও বিরক্ত হবে। একথা ভেবেই ছেলেরা এ কাজে পুরোপুরি রাজি হল।

সংযুক্ত ফলাবর্তন (সম্ভাব্য দিক) :

- চলিত রীতি কৃত্রিমতাবর্জিত, হালকা চালের, আটপৌরে ভাষা।
- মূলত মৌখিক রূপে এর ব্যবহার বেশি।
- এ ভাষা পরিবর্তনশীল ভাষা। স্বরলোপ, স্বরসঙ্গতি, অভিশ্রুতি, সমীভবন, স্বরাগম প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় এ ভাষার শব্দ নিয়ত পরিবর্তনশীল।
- সময় বিবেচনায় এ ভাষা নতুন।
- শিল্পরস সৃষ্টিতে এ ভাষারীতি অত্যন্ত সহায়ক।
- এ ভাষার অভিযোজন ক্ষমতা খুব বেশি। যে কোন ভাষার শব্দকে সে নিজের করে নিতে পারে।

ইউনিট ৩ **অধিবেশন ৬**

ব্যাকরণ-বিশ্লেষণ: সমাস

চলমান প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত ও পরিশীলিত হওয়াই ভাষার সহজাত ধর্ম। এই পরিপ্রেক্ষিতেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অজস্র শব্দ এসেছে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে। বাংলা ভাষার নতুন শব্দ গঠনের প্রধান তিনটি প্রক্রিয়ার একটি হচ্ছে সমাস। অন্য দুটি প্রত্যয় ও উপসর্গ। সমাসের আলোচনা আবার বাংলা ব্যাকরণের রূপতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। রূপতত্ত্বের কাজ হচ্ছে শব্দের গঠন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা। সমাসের আলোচনাতেও দেখা যাবে অর্থ সম্বন্ধযুক্ত একাধিক শব্দ একসঙ্গে যুক্ত হয়ে কীভাবে একটি বড় শব্দ গঠন করে; একাধিক পদ কীভাবে একপদে রূপান্তরিত হয়; বক্তব্য, বিষয় কীভাবে সংক্ষিপ্ত হয়; শব্দ-মিলন আসলে কীভাবে সাধিত হয়– প্রভৃতি প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণই এর মূল উপজীব্য।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- সমাসের সংজ্ঞা ও এর প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার সমাসের স্বরূপ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- শ্রেণীতে সমাস পাঠদানের উপযোগী পদ্ধতি ও কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক: সমাস কী এবং কেন

সমাস শব্দের অর্থ সংক্ষেপ বা ছোট। দীর্ঘ বাক্য অনেক সময় শুনতে ও পড়তে ভাল লাগে না, তাই অনেক সময় বাক্যকে শ্রুতিমধুর ও সুন্দর করার জন্য তাকে সংক্ষিপ্ত করতে হয়। বাক্যের ভিতরে যেসকল পদ পরস্পর অর্থ সম্পর্কযুক্ত সেগুলোকে একপদে পরিণত করলে বাক্য স্বভাবতই ছোট হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে সমাস বলা হয়। সমাস একটি প্রক্রিয়ার নাম। এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত বিভিন্ন দিক বা নামের একটি উদাহরণ নিচে চিহ্নিত হল।

সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন; এখানে-

ব্যাসবাক্য= সিংহ চিহ্নিত আসন
সমস্তপদ= সিংহাসন
সমস্যমান পদ= সিংহ, চিহ্নিত এবং আসন
পূর্বপদ= সিংহ
পরপদ= আসন

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরের তথ্যসমূহ বিবেচনায় রেখে এবার নিচের ছকটি পূরণ করুন ও ছকের নিচে প্রদত্ত দিকগুলোর সংজ্ঞা লিখুন। লেখা শেষে মূল শিখনীয় বিষয়ের সংশ্লিষ্ট অংশের সাথে মিলিয়ে আপনার অর্জন পরীক্ষা করুন।

শব্দ	**ব্যাসবাক্য**	**পূর্বপদ**	**পরপদ**	**সমস্যমানপদ**	**সমস্তপদ**
চিরসুখ নীলাকাশ জলচর					
সংজ্ঞা লিখি- ব্যাসবাক্য: পূর্বপদ: পরপদ: সমস্যমানপদ: সমস্তপদ: সমাস:					

পর্ব-খ: সমাসের প্রকারভেদ

বাংলা সমাস প্রধানত ছয় প্রকার। যথা- দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, দ্বিগু এবং অব্যয়ীভাব। বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতাই এই শ্রেণীভাগের মূল ভিত্তি। সেক্ষেত্রে প্রতিটি সমাসের স্বতন্ত্র স্বরূপ অনুধাবনের জন্য নিম্নবর্ণিত দিকসমূহ বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে:

সমাসের নাম	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
দ্বন্দ্ব	প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে।	তাল-তমাল, মা-বাপ, দেখা-শোনা
কর্মধারয়	বিশেষণ পদের সাথে বিশেষ্য পদের সমাস হয় এবং পরপদের (বিশেষ্যের) অর্থই প্রধান্য পায়।	নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম , যা কাঁচা তা-ই মিঠা = কাঁচামিঠা
তৎপুরুষ	পূর্বপদের দ্বিতীয়াদি বিভক্তির লোপ পায় এবং পর পদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায়।	মধুতে মাখা = মধুমাখা
বহুব্রীহি	সমস্যমান পদগুলোর কোনটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায়।	দশ আনন যার = দশানন (রাবণ), হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি।
দ্বিগু	সমাহার বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের সমাস হয় এবং সমাসনিস্পন্ন পদটি বিশেষ্য হয়।	তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল, শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী
অব্যয়ীভাব	পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিস্পণ্ন হয় এবং অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে।	জানু পর্যন্ত লম্বিত = আজানুলম্বিত ইষৎ নত= আনত

প্রিয় শিক্ষার্থী, উপরে বর্ণিত তথ্যসমূহ বিবেচনায় রেখে নিম্নবর্ণিত উদাহরণগুলোর প্রকৃতি বিশ্লে-ষণ করে ধরনের অভিন্নতার ভিত্তিতে ছকের উদাহরণ কলামে সাজিয়ে লিখুন এবং উদাহরণগুলোর বৈশিষ্ট্য ও সমাসের নাম উল্লেখ করুন:

হাত ও পা = হাত-পা

গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি

পঞ্চবটের সমাহার = পঞ্চবটী

কণ্ঠ পর্যন্ত = আকণ্ঠ

যে শান্ত সেই শিষ্ট = শান্তশিষ্ট

বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন

আয়ত লোচন যার = আয়তলোচন

ভাল ও মন্দ = ভাল-মন্দ

আমিষের অভাব = নিরামিষ

সুন্দরী যে লতা = সুন্দরলতা

নদী মাতা যার = নদীমাতৃক শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী

উদাহরণ	বৈশিষ্ট্য	সমাসের নাম

আসুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার আরেকটি ছক পূরণ করি-

উদাহরণ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
নদীমাতৃক সাত সমুদ্র সেতার দা-কুমড়ো হাতে খড়ি আপাদমস্তক		

পর্ব-গঃ শ্রেণীতে সমাস পাঠদান

শ্রেণীতে ব্যাকরণ পঠন-পাঠনের দীর্ঘ দিনের বহুল প্রচলিত যেসব পদ্ধতি - আরোহ, অবরোহ এবং আরোহ-অবরোহ পদ্ধতি, তার তিনটিই মূলত সূত্র ও উদাহরণের পর্যায়ক্রমিক উপস্থাপন সংশ্লিষ্ট। ব্যাকরণ পাঠদানকে আরো কার্যকর, অংশগ্রহণমূলক ও অর্থপূর্ণ করার জন্য উপরোক্ত পদ্ধতিসমূহের সাথে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিসমূহের বিভিন্ন কলাকৌশলের সমন্বয় সাধন করা যায়। যেমন শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক সমাস পাঠদানের উপস্থাপন অংশের একটি শীর্ষের নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করতে পারেন।

প্রিয় শিক্ষার্থী, কাজগুলো এখানে পর্যায়ক্রমিকভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয় নি। দেখা যাক আপনি নিজে চিন্তা করে পর্যায়ক্রমিকভাবে সাজাতে পারেন কি না।

উদাহরণ বিশ্লেষণ	১.
সূত্রগঠন	২.
শিক্ষার্থীর অনুশীলন	৩.
ফলাবর্তন	৪.
উদাহরণ উপস্থাপন	৫.

শ্রেণীতে পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে আগে যেমন দুটি অধিবেশনে দেখানে হয়েছে, কার্যক্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষকের মূল কাজ হচ্ছে নির্দেশনা দেওয়া ও কাজে সহযোগিতা করা।

আসুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা সে সব বিবেচনা মাথায় রেখে সমাস পাঠদানের ক্ষেত্রে শ্রেণীতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর করণীয় সম্পর্কিত তথ্য দিয়ে নিচের ছকটি পূরণ করি এবং পরে মূল শিক্ষনীয় বিষয়ের সংশ্লিষ্ট অংশের সাথে মিলিয়ে নিজ নিজ উত্তরের যথার্থতা যাচাই করি।

কৌশল	**শিক্ষকের করণীয়**
১. শ্রেণীকরণ	
২. পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ	
৩. পোস্টার উপস্থাপন	
৪. তুলনামূলক বৈষম্য অনুসন্ধান	
৫. সত্য-মিথ্যা	
৬. ত্রুটি শনাক্তকরণ	

ইউনিট ৩ **অধিবেশন ৬**

মূল শিখনীয় বিষয়
ব্যাকরণ বিশ্লেষণ-সমাস

সমাসঃ দুই বা ততোধিক পদের একপদীকরণকে সমাস বলা হয়। যে পদগুলোর একীকরণ করা হয়, সেগুলোকে বলে সমস্যমান পদ , সমাসবদ্ধ পদকে বলে সমস্তপদ এবং যে বাক্যাংশের সাহায্যে সমাসকে বিশ্লেষণ করা হয় সেটিকে বলে ব্যাসবাক্য। যেমন- সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, চিরকাল ব্যাপিয়া সুখ= চিরসুখ, জলে চরে যে/যা= জলচর
এখানে- (প্রথম উদাহরণে)

সমস্যমান পদ = সিংহ, চিহ্নিত এবং আসন; অর্থাৎ সমাসের সাহায্যে যে ক'টি পদকে সংক্ষিপ্ত করা হয় তাদের সবক'টিই আলাদা আলাদাভাবে সমস্যমান পদ। এদের মধ্যে প্রথমটিকে বলে পূর্বপদ এবং পরবর্তী পদ/পদগুলোকে বলে পরপদ।

সমস্তপদ = সিংহাসন; অর্থাৎ সমাসনিষ্পন্ন পদটির নাম সমস্তপদ।

ব্যাসবাক্য = সিংহ চিহ্নিত আসন; অর্থাৎ সমাসবদ্ধ পদটিকে বিশ্লেষণ করার জন্য যে বাক্যের বা বাক্যাংশের প্রয়োজন হয়; তাকে ব্যাসবাক্য বলে।

সমাসের প্রকারভেদ : সমাস প্রধানত ছয় প্রকার । যথা- দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, দ্বিগু এবং অব্যয়ীভাব।

(১) **দ্বন্দ্ব সমাস :** যে সমাসে সমান বিভক্তিবিশিষ্ট একাধিক বিশেষ্যপদ এরূপে মিলিত হয় যে, প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন– তাল-তমাল, মা-বাপ, দেখা- শোনা, দয়া-মায়া।

(২) **কর্মধারয় :** যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের (বিশেষ্যের) অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন- নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম , যা কাঁচা তা-ই মিঠা = কাঁচামিঠা। কর্মধারয় সমাসে সাধারণত বিশেষণ পদ আগে বসে। কর্মধারয় সমাস বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যথা-

- মধ্যপদলোপী কর্মধারয় : পল (মাংস) মিশ্রিত অন্য= পলান্ন
- উপমান কর্মধারয় : কুসুমের (উপমান পদ) ন্যায় কোমল (সাধারণ ধর্মবাচক শব্দ) = কুসুমকোমল

- উপমিত কর্মধারয় : চরণ (উপমিত) কমলের (উপমান) ন্যায় = চরণকমল
- রূপক কর্মধারয় : দুঃখ রূপ অনল = দুঃখানল

(৩) **তৎপুরুষ :** পূর্ব পদের দ্বিতীয়াদি বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পর পদের অর্থ প্রধানভাবে বুঝায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

যেমন- মধুতে মাখা = মধুমাখা

তৎপুরুষ সমাস নিম্নবর্ণিত নয় প্রকারের হয়ে থাকে-

- দ্বিতীয়া তৎপুরুষ : বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন
- তৃতীয়া তৎপুরুষ : মধু দিয়ে মাখা = মধুমাখা
- চতুর্থী তৎপুরুষ : বিয়ের জন্য পাগল = বিয়েপাগল
- পঞ্চমী তৎপুরুষ : জন্ম থেকে অন্ধ = জন্মান্ধ
- ষষ্ঠী তৎপুরুষ : পথের রাজা = রাজপথ
- উপপদ তৎপুরুষ : জলে চরে যে = জলচর (জলচর একটি উপপদ; কারণ জল একটি পদ, চর্ একটি ধাতু এবং এ একটি প্রত্যয়)
  কলম পেষে যে = কলম-পেষা (এখানে কলম-পেষা একটি উপপদ; কারণ কলম একটি পদ, পেষ্ একটি ধাতু এবং আ একটি প্রত্যয়)
- নঞ তৎপুরুষ : নাই (নঞর্থক অব্যয়) মিল = অমিল
- অলুক তৎপুরুষ : সাপে কাটা = সাপে-কাটা

(৪) **বহুব্রীহি সমাস** : যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন- দশ আনন যার = দশানন (রাবন), হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি। বহুব্রীহি সমাসের শ্রেণীভাগ নিম্নরূপ:

- সমানাধিকরণ : পোড়া (বিশেষণ) মুখ (বিশেষ্য) যার = মুখপোড়া
- ব্যধিকরণ: বীণা (বিশেষ্য) পাণিতে (বিশেষ্য) যার = বীণাপানি
- ব্যতিহার: হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি (একই পদের দ্বিত্বতা এবং পারস্পরিক ক্রিয়া বুঝাচ্ছে)
- মধ্যপদলোপী: চন্দ্রের ন্যায় বদন যার = চন্দ্রবদনা
- নঞর্থক: নাই লজ্জা যার = নিলজ্জ
- অলুক: গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়ে-হলুদ
- সংখ্যাবাচক : দশ গজ (বিশেষ্য) পরিমাণ যার = দশগজি (বিশেষণ)
- প্রত্যয়ান্ত : এক দিকে চোখ যার = একচোখা (চোখ + আ)

(৫) **দ্বিগু সমাস :** সমাহার বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয় তাকে দ্বিগু সমাস বলে। দ্বিগু সমাসে সমাসনিষ্পন্ন পদটি বিশেষ্য পদ হয়। যেমন- তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল, শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী ।

(৬) **অব্যয়ীভাব সমাস :** পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে ।
যেমন- জানু পর্যন্ত লম্বিত = আজানুলম্বিত ।
ইষৎ নত- আনত, আমিষের অভাব = নিরামিষ ।

সমাস পাঠদান পদ্ধতি : বাংলা ব্যাকরণ পাঠদানের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন অংশের একটি সাধারণ পর্যায়ক্রম রয়েছে। পর্যায়ক্রমটি নিম্নরূপ:

উদাহরণ উপস্থাপন, উদাহরণ বিশ্লেষণ, সূত্রগঠন, শিক্ষার্থীদের অনুশীলন, শিক্ষকের ফলাবর্তন

শ্রেণীতে সমাস পাঠদানের ক্ষেত্রেও শিক্ষক প্রতিটি ক্লাসের নির্ধারিত বিষয়বস্তু উপর্যুক্ত পর্যায়ক্রম অনুসরণ করে উপস্থাপন করতে পারেন। কেবল তা-ই নয়, পুরো ক্লাসের বিষয়বস্তুর খন্ডিত অংশ/পর্ব উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও ঐ পর্যায়ক্রম অনুসৃত হতে পারে।

উপর্যুক্ত পর্যায়ক্রমের অংশ হিসেবে সমাস পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক নিম্নবর্ণিত কৌশলসমূহও প্রয়োগ করতে পারেন।

কৌশল	শিক্ষকের করণীয়
শ্রেণীকরণ	• প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে এলোমেলোভাবে মিশ্রিত একগুচ্ছ তথ্য উপস্থাপন করা। • জোড়ায়/ দলে চিন্তা করে এগুলোকে শ্রেণীকরণ করতে বলা।
পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ	• বিভিন্ন প্রকার সমাসের উদাহরণ আহরণের জন্য পাঠ্যপুস্তকের ভিতরে অনুসন্ধান করতে বলা ।
পোস্টার	• বিভিন্ন প্রকার সমাসের অর্জিত ধারণাসমূহের রূপরেখা পোস্টারে

উপস্থাপন	লিখে উপস্থাপন করতে বলা ।
তুলনামূলক বৈষম্য অনুসন্ধান	• দু'টি সমাসের বিভিন্ন উদাহরণ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করে তুলনা করা। • জোড়ায় চিন্তা করে উদাহরণ দু'টোর তুলনা করে বৈষম্যসমূহ/পার্থক্যগুলো চিহ্নিত করতে বলা ।
সত্য-মিথ্যা	• সমাস সম্পর্কিত কিছুসংখ্যক বিবৃতি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা। • বিবৃতিগুলো সত্য না মিথ্যা, মিথ্যা হলে কেন মিথ্যা তা শিক্ষার্থীদেরকে দলে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে বলা।
ত্রুটি শনাক্তিকরণ	• ভুল তথ্য সন্নিবেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে সমাস সম্পর্কিত কিছু উপস্থাপনা তুলে ধরা। • শিক্ষার্থীদেরকে ত্রুটিগুলো শনাক্ত করতে এবং সংশোধনের প্রয়োজনীয় সুপারিশ করতে বলা ।

ইউনিট -৩ **অধিবেশন -৭**

অনুবাদ-শিক্ষণ

শব্দার্থের দিক বিবেচনা করলে 'অনু' অর্থ সদৃশ, 'বাদ' অর্থ কথন– ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দাঁড়ায় এক ভাষার কথা সদৃশভাবে অন্য ভাষায় বলা। প্রকৃত পক্ষে অনুবাদ বলতে বুঝতে হবে : কোনো ভাষা-প্রকাশকে বা রচনাকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় উপস্থাপিত করা। ভাষা ব্যবহারকারীর কাছে রচনার বক্তব্য বিষয়ের পরিবর্তন না করে ভাষাগত পরিবর্তনই অনুবাদ বলে বিবেচিত। সংক্ষেপে বলা যায় : এক ভাষার কথা সদৃশভাবে অন্য ভাষায় বলাই হলো অনুবাদ।

অনুবাদ একটি শিল্প কর্ম, এক ভাষার ভাব ও বাণীকে অন্য ভাষায় স্থানান্তরিত করার মাধ্যমেই এই অনুবাদ কর্ম সম্পাদন হয়।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- অনুবাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অনুবাদের বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ নির্দেশ করতে পারবেন।
- অনুবাদের ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবেন ।
- অনুবাদের রীতি-পদ্ধতি অনুশীলন করা।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : অনুবাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

জ্ঞান রাজ্যের যে কোন শাখার জন্য অনুবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়। প্রতিদিন বিভিন্ন ভাষায় নতুন নতুন রচনাকর্ম সৃজিত হচ্ছে। এ সকল রচনাকর্মের সাথে পরিচিত হওয়ার অন্যতম উপায় অনুবাদ। অনুবাদের মাধ্যমে নিজস্ব ভাষা সাহিত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি সম্ভব। বস্তুত অনুবাদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে নবতর সৃষ্টি ও ক্রমান্বিত সমৃদ্ধির সহায়ক। অনুবাদের অবদান হিসেবেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসম্পদ বহু ভাষাভাষীর সম্পদ হয়ে উঠেছে।

তথ্য প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখার ক্ষেত্রেও অনুবাদের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বজুড়ে বিচিত্র প্রচার মাধ্যম তথ্যের বিনিময় করে চলেছে। ইলেকট্রনিক মাধ্যম ও মুদ্রিত উপকরণ যে ভাব-তথ্য বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছে তা সম্ভব হয়েছে অনুবাদের মাধ্যমেই।

পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা, বিশেষ করে সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় রচিত বহু গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয়েছে। অনুবাদের এই প্রচেষ্টা সুদীর্ঘকাল থেকেই অব্যাহত রয়েছে। পবিত্র

কোরান শরিফ অনুবাদ করে খ্যাত হয়ে আছেন ভাই গিরীশ চন্দ্র সেন; পবিত্র ধর্মগ্রন্থ রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল ইত্যাদি বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়েছে। হিন্দি ভাষায় রচিত মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' অনুদিত হয়েছে বাংলায় 'পদ্মাবতী' নামে। ইংরেজি ভাষায় রচিত বিশ্বখ্যাত নাট্যকার শেক্সপিয়ারের প্রায় সবগ্রন্থই বাংলায় অনূদিত হয়েছে। অনূদিত হয়েছেন শেলি, কীট্স, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বার্ট্রান্ড প্রমুখ বরেণ্য ইংরেজ কবি-সাহিত্যিকগণও।

ভাষা প্রয়োগবাদের দিক থেকে বিবেচনা করলে বলা যায় : অনুবাদের গুরুত্ব সংক্ষেপে নিম্নরূপ হতে পারে—

১. সংস্কৃতি সমন্বয় ২. ভাষা-সমন্বয় ৩. যোগাযোগ রক্ষা ৪. জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময় ৫. আন্তর্জাতিকতা বোধের বিকাশ।

মোট কথা, ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন, মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনুবাদ শিক্ষাকে গ্রহণযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করতে হয়।

এই পর্যায়ে অনুবাদের গুরুত্ব সম্পর্কে আপনি আর কি কোনো দিক উল্লেখ করতে পারেন? তা হলে তা করুন।

পর্ব-খ : অনুবাদের শ্রেণীবিভাগ ও বৈশিষ্ট্য

এক ॥ শ্রেণীবিভাগ : অনুবাদ সাধারণত ২ ধরনের বলে ধরা হয় : (ক) আক্ষরিক অনুবাদ (Literary translation) এবং (খ) ভাবানুবাদ (Thematic translation)। নিচের দুটি নমুনা পর্যবেক্ষণ করা যাক :

(ক) ''বাগান কেবল সৌন্দর্যের উৎস নয়, মানুষের আয়ের উৎস। ফুলের প্রতি প্রবল ভালবাসার জন্যে মানুষ বিশেষ উপলক্ষে ফুল দিয়ে ঘর সাজায়। ফুল সৌন্দর্য ও পবিত্রতার প্রতীক বলে মানুষ ফুল ভালবাসে।''

'A garden is not a source of beauty only, it is also a source of income to men. Men for their great love of flower decorate their homes with them in occasions. Men love flowers for they are the symbols of beauty and purity.'

(খ) ''পরদিন কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হয়ে ফটিক কারও প্রত্যাশায় ফ্যাল ফ্যাল করে ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখল। বিশ্বম্ভর তার মনের ভাব বুঝে তার কানে ফিস ফিস করে বলল, ফটিক, তোর মাকে আনতে পাঠিয়েছি।''

'The next day Fatik became coscious for a short time and looked blankly all around the room as if expecting someone to come. Bisamber read his thought and whisphered in his ear, 'Fatik, I have sent for your mother.'

(সূত্রঃ ড. হায়াৎ মামুদ, ভাষাশিক্ষা)

প্রথমটি আক্ষরিক অনুবাদ, দ্বিতীয়টি ভাবানুবাদ।

আক্ষরিক অনুবাদে শব্দার্থকে বিশদভাবে অনুসরণ করে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়। আক্ষরিক অনুবাদ শিল্প-সাহিত্যের বিচারে উৎকৃষ্ট নয়। কারণ অনুবাদ এখানে শব্দার্থক্রমেই হয়, ভাষার লালিত্য, গঠন কৌশল ও কলানৈপুণ্য তখন অবহেলিত হয়।

ভাবানুবাদে মূল বিষয়বস্তুর ভাব ও তার বিশ্লেষণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুদিত হয়। এধরনের অনুবাদে মূল অংশের ভাববস্তু ও তার বিশ্লেষণ অনুদিত অংশেরও অনুরূপ ভাবে স্থান পায়।

এদুটি ছাড়াও আর এক ধরনের অনুবাদের কথা বলা হয়– রসানুবাদ : এতে মূল অংশের রস, ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা অনুদিত অংশের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। রসানুবাদই সাহিত্য বিচারে সার্থক অনুবাদ। নন্দনতত্ত্বের বিচারেও রসানুবাদই সর্বাধিক গ্রহণীয়। প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব গঠনবৈচিত্র্য আছে। রসানুবাদের ক্ষেত্রে অনুদিত অংশের মধ্যেও অনুবাদকের নিজস্ব রচনাশৈলী, শব্দবিন্যাস, ভাষাগত বৈশিষ্ট্য থাকবে, তার সঙ্গে তিনি অনূদিত অংশের মধ্যে রসধ্বনি সঞ্চারিত করবেন, সাহিত্যগুণে তাকে সমৃদ্ধ করে তুলবেন।

দুই ॥ বৈশিষ্ট্য :

১. মূলের ভাব ও উপমা অনুবাদে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে। মূলের মতো সৃজনধর্মী মৌলিক রচনা হিসেবে বিবেচিত হলেই অনুবাদের সার্থকতা। এ উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত দিকগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন-

   বাক্যগঠনরীতি –প্রত্যেকটি ভাষারই নিজস্ব বাক্যগঠনরীতি বা বাকরীতি রয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে নিজস্ব ভাষার গঠনরীতিকেই অনুসরণ করতে হবে।

   বাগধারা –অনুবাদের নিজস্ব ভাষার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হবে। "Many men many minds" এর অনুবাদ 'অনেক মানুষ অনেক মন' না হয়ে হবে নানা মুনির নানা মত।

   শব্দাবলীর প্রয়োগ –মূলের শব্দের অর্থ ও প্রয়োগিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

   সংগঠন –অনুবাদের স্বচ্ছতার প্রয়োজনে দীর্ঘবাক্য পরিহার করা প্রয়োজন।

   পরিভাষা –অনুবাদে যথার্থ পারিভাষিক শব্দাবলি ব্যবহার করতে হবে।

২. অনুবাদ যেহেতু প্রধানত দু'রকমের তাই দুই ক্ষেত্রে দু'রকমের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে হয়।

   আক্ষরিক অনুবাদে মূলভাষার প্রত্যেকটি শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এতে মূলের বাকরীতিও অনুসরণের প্রয়াস থাকে। ধর্মগ্রন্থ অনুবাদের ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদের প্রাধান্য লক্ষণীয়।

ভাবানুবাদে মূল ভাষার ভাব যথাযথ রেখে অপর ভাষার শব্দ, বাকরীতি ও গঠনবিন্যাস অনুসৃত হয়।

উভয় দিক বিবেচনা করে বলা যায় : কোনো রচনা অনুবাদের সময় আক্ষরিক এবং ভাবানুবাদের কথা মনে রেখে, সহজ বক্তব্য হলে আক্ষরিক অনুবাদ এবং অপেক্ষকৃত আবেগপূর্ণ বা সাহিত্যিক বক্তব্যের ক্ষেত্রে ভাবানুবাদের আশ্রয় নেয়া যায়।

অনুবাদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনটিকে আপনি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে কেন মনে করেন? নিচের অনুচ্ছেদটির একটি উপযুক্ত অনুবাদ উপস্থাপন করুন ।

Youth is the best time in our life. We must sow the seeds of industry, truthfulness, virtue and honesty in this season to reap the harvest of prosperity and happiness.

পর্ব-গ : ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ

এক ॥ সমস্যা ও অনুসৃতব্য কৌশল -

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ হচ্ছে 'A translator is a traitor'- অর্থাৎ একজন অনুবাদক হচ্ছেন বিশ্বাসঘাতক। এক ভাষার বাণী ও শিল্পসৌন্দর্যকে অন্যভাষায় হুবহু রূপান্তর সত্যিই দুরূহ ও জটিল ব্যাপার। প্রত্যেক ভাষার রয়েছে নিজস্ব রূপসৌন্দর্য, ধ্বনিমাধুর্য, বাকরীতি, প্রকাশভঙ্গি ও নিজস্ব ধারা, এগুলো বজায় রেখে অনুবাদ করা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তথাপি, একজন সার্থক অনুবাদক তার মেধা ও যোগ্যতার মাধ্যমে অনেকটাই সফল হতে পারেন। সফল হওয়ার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হয় :

ক) বাংলা বাকরীতির সঙ্গে ইংরেজি বাকরীতির বিশেষ কোনো মিল নেই। বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদ প্রায়ই বাক্যের প্রথমে, মধ্যে ও শেষভাগে বসে; কিন্তু ইংরেজিতে কর্তা অধিকাংশ স্থলেই প্রথমে বসে। He gave to his son whatever he wanted – এই বাক্যের বিন্যাসরীতি লক্ষণীয়। হুবহু অনুবাদ করলে বাংলায় এরূপ দাঁড়াবে – তিনি দিলেন তাঁর পুত্রকে যা কিছু সে চাইলো। বাংলাতে এই ভাবে বাক্য রচিত হয় না, কথিত বা প্রকাশিতও হয় না। এটির অনুবাদ হওয়া উচিত – তাঁর পুত্র যা কিছু চাইলো তা-ই তাকে তিনি দিলেন।

খ) ইংরেজিতে প্রকাশভঙ্গি অনেক ক্ষেত্রেই বাংলা থেকে ভিন্নরকম। Will you take a little tea with me? এর অনুবাদ এরকম হবে না - আমার সঙ্গে আপনি অল্প চা নেবেন ? বরং হবে – আমার সঙ্গে একটু চা খাবেন ?

গ) ইংরেজি বাগবিধি ও ভাব অনুযায়ী He first broke the ice বাক্যটির অনুবাদ 'তিনিই প্রথম বরফ ভঙ্গ করেন' হবে হাস্যকর; বরং যথার্থ অনুবাদ হবে– তিনিই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করেন। তেমনি A bad workman quarrels with his tools – এ বাক্যটিকে 'নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা' রূপে অনুবাদ করার ভাবানুষঙ্গ যদি অনুবাদকের মধ্যে না আসে, তবে আক্ষরিক অনুবাদ হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করবে।

ঘ) ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদে **কিছু আভাস** -

অনুবাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা হলো অনুবাদককে দুটি ভাষারই নাড়ির জ্ঞান খুব ভাল থাকতে হবে। এটি যদিও সহজে বা অল্প সময়ে হয়ে ওঠে না, তবু চর্চা ও বিবেচনার মাধ্যমে এতে সাফল্য লাভ করা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিজের মাতৃভাষা বা প্রথম (L1) ভাষার জ্ঞান ভাল থাকলে যে ভাষা থেকে মাতৃভাষায় অনুবাদ করা হবে (দ্বিতীয় ভাষা L2) সেটির প্রকৃতি বোঝা সহজ হয়। দুই ভাষার প্রকৃতি এবং মেজাজ বুঝেই অনুবাদে সাফল্য লাভ করা যায়।

শিক্ষার্থীদের জন্য অবশ্য কিছু দিক নির্দেশনা এই রকম হতে পারে :

১. প্রচুর বাংলা ও ইংরেজি শব্দ আয়ত্ত করা।

২. একটি ইংরেজি শব্দের সর্বাধিক বাংলা প্রতিশব্দ আয়ত্ত করা।

৩. সহজ ও সুপ্রচলিত শব্দ চয়ন করা। বাংলায় বহুল প্রচলিত বিদেশী শব্দের অনুবাদের প্রয়োজন নেই; তবে বিদেশী শব্দের ব্যবহার যথাযথ ও সর্বজন বোধগম্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪. ইংরেজি পারিভাষিক শব্দের ক্ষেত্রে যথার্থ বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করতে হবে। যথাযথ বাংলা পরিভাষা পাওয়া না গেলে উদ্ধৃতিটিকে ঐ শব্দের ইংরেজি উচ্চারণে লেখা যায়।

৫. যে অংশের অনুবাদ তা বারবার পড়া এবং তার ভাব ও মর্ম অনুধাবন করা।

৬. অনুবাদে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি যথাযথ রক্ষা করতে হবে।

৭. অনুবাদে অনুবাদকে নিজস্ব রচনা, ভাষা বিন্যাস ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে।

ঙ) **ভাষার অভ্যন্তরীণ** দিক -

৮. ইংরেজি বাক্যে Verb উহ্য থাকে না, কিন্তু বাংলায় ক্রিয়া (যায়, হয়, আছে ইত্যাদি) উহ্য থাকে। যেমন- Mitun is a good girl -এর বাংলা অনুবাদ হচ্ছে 'মিতুন ভালো মেয়ে' (is এর বাংলা 'হয়' উহ্য)।

৯. বানান ও উচ্চরণগত পার্থক্য নামের ভিন্নতা এসব ব্যাপরে সচেতন থাকতে হবে। Mymensing ময়মনসিংহ, Jhenidah - ঝিনাইদহ, Jessore - যশোর, Soudi Arabia - সৌদি আরব। নামের ভিন্নতা - India - ভারত, The Nile - নীলনদ ইত্যাদি।

১০. কোনো বাক্যের অংশ ইংরেজিতে থাকলে তা সকল ক্ষেত্রে বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজন হয় না। যেমন - He was a teacher of the deparrtment of Bangla– এর অনুবাদে 'তিনি বাংলা বিভাগের শিক্ষক ছিলেন' – এখানে 'একজন বা এক' লেখার দরকার নেই।

১১. ইংরেজি জটিল বাক্যকে একাধিক সরল বাক্যে অনুবাদ করে নেয়া ভালো। যেমন– Kazi Nazrul Islam was a great poet who wrote Chokrobak– এর বঙ্গানুবাদ দুটি সরল বাক্যে করা যায় : কাজী নজরুল ইসলাম বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি চক্রবাক রচনা করেন।

১২. মূল ভাষার শব্দভান্ডার, বাকরীতি, প্রকাশভঙ্গি, মেজাজ ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদের প্রধান সমস্যা কী বলে আপনি মনে করেন? এর সমাধান কীভাবে করা যেতে পারে?

পর্ব-ঘ : অনুবাদ শিক্ষদান

আসলে অনুবাদ শিক্ষাদানের কাজটি সহজ নয়। সার্থক অনুবাদে দুটি ভাষারই দখল থাকতে হয় বলে দুই ভাষারই জ্ঞানের একটি বিশিষ্ট পর্যায়ে উপনীত হওয়া পর্যন্ত অনুবাদ শিক্ষাদান শুরু করা উচিত নয়। অনুবাদ শিক্ষাদানের কয়েকটি পর্যায়ক্রম অনুসরণ করা যায় :

ক. গল্পবলা ও শোনা – পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজনে দেশের ও বিদেশের রূপকথা, গল্প প্রভৃতি পাঠ করতে হবে। গল্পশোনার আগ্রহকে অতি সন্তর্পণে অনুবাদের দিকে নিয়ে যেতে হয়। শিশুর অবচেতন মনে মাতৃভাষা ও বিদেশি ভাষাচর্চার স্পৃহা জেগে ওঠে।

খ. পাঠ্যপুস্তক থেকে অনুবাদ – এপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা প্রথমে বিভিন্ন শব্দের অনুবাদ করে তার প্রতিশব্দ জানবে এবং শব্দের প্রতীকী-দ্যোতনা সম্পর্কে অবহিত হবে। পরে ছোট ছোট বাক্যাংশ ও বাক্য অনুবাদ করে দুটি ভাষার গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে তুলনামূলক ধারণা গড়ে নেবে। অনুবাদ কর্মের প্রথম আড়ষ্টতা এভাবে কাটিয়ে ওঠা যায়।

গ. পত্রিকা স্বয়ং-সংকলন – অনুবাদে অনুপ্রেরণা জোগানোর জন্য দেয়াল পত্রিকা, স্বয়ং-সংকলন, বরেণ্য সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদদের বাণী-সংকলিত দেয়াল পত্র ইত্যাদির সাহায্য নেয়া যায়।

এগুলো ছাড়া শিক্ষাকে বিশেষ কিছু বিষয়ে যত্ন নিতে হবে :

১. অনুবাদে নির্বাচিত অংশ শিক্ষক কয়েকবার পড়ে দেবেন এবং তার ভাববস্তু আলোচনা করবেন।

২. কঠিন শব্দের অর্থ, বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচনের বিশিষ্ট অর্থ ও তদনুরূপ বাগ্‌ধারা, সমুচ্চারিত শব্দের অর্থের পার্থক্য, টেকনিক্যাল শব্দের অর্থ পরিভাষা, বিভিন্নার্থক শব্দের অর্থ এবং মূল বিষয়ের কঠিন অংশের অর্থ শিক্ষক বোর্ডে লিখে দেবেন।

৩. যে সকল ক্ষেত্রে শাব্দিক অনুবাদ অর্থহীন হয়, সেখানে ভাবানুবাদ করার পরামর্শ শিক্ষক দেবেন।

৪. মাঝে মাঝে বিশিষ্ট লেখককৃত অনুবাদ শ্রেণীতে পড়ে শোনাবেন এবং অংশ বিশেষ বোর্ডে লিখে দেবেন।

৫. পূর্বজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে অনুবাদ শুরু করাতে হবে, অন্যথায় একাজে শিক্ষার্থীরা বিরূপ হয়ে উঠবে।

৬. শিক্ষার্থীদের যে ইংরেজি পুস্তকটি পাঠ্য সেটি থেকে অনুবাদ কার্যের সূচনা করতে হবে; তারপর অনুবাদের কৌশল কিছুটা অর্জিত হলে অন্যান্য সূত্র থেকে অনুবাদ করানো যেতে পারে। তবে পাঠ্য পুস্তকের অনুরূপ সহজ ও চিত্তাকর্ষক ইংরেজি রচনার অংশবিশেষ থেকে অনুবাদ করতে দিতে হবে।

৭. অনুবাদ কাজে মোটামুটি দক্ষতা অর্জিত হলে শিক্ষার্থীদের সাহিত্য-রসসম্পন্ন বিষয় অনুবাদ করতে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষককে বিশেষ সহায়তা করতে হবে।

৮. অনুবাদ শিক্ষদানে অভিধানের ব্যবহার অপরিহার্য। এজন্য অভিধান পঠন/ব্যবহার পদ্ধতি ও অনুবাদের সময় অভিধান দিতে হবে।

৯. শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুবাদকর্ম সংশোধন ও মূল্যায়ন করবেন যত্ন সহকারে।

১০. পূর্বপ্রণীত পাঠ-পরিকল্পনা অনুসরণে অনুবাদ শিক্ষা দিতে হবে।

সার্থক অনুবাদের জন্য অনুশীলনের কোনো বিকল্প নাই।

অনুবাদ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর কৌশল কী বা কী-কী হতে পারে? বর্ণনা করুন।

ইউনিট ৩ **অধিবেশন ৭**

মূল শিখনীয় বিষয়
অনুবাদ-শিক্ষণ

১. অনুবাদ একটি শিল্পকর্ম, এক ভাষার ভাব ও বাণীকে অন্য ভাষায় স্থানান্তরিত করার নামই অনুবাদ। ভাষা দক্ষতার ক্ষেত্রে অনুবাদের গুরুত্ব রয়েছে। আবার, জ্ঞানরাজ্যের যে কোন শাখা ও সংক্ষেপের জন্য অনুবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়। প্রতিদিন বিভিন্ন ভাষায় নতুন নতুন রচনাকর্ম সৃজিত হচ্ছে। এ রচনাকর্মের সাথে পরিচিত হওয়ার অন্যতম উপায় অনুবাদ। অনুবাদের মাধ্যমে নিজস্ব ভাষা সাহিত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি সম্ভব।

২. অনুবাদ প্রকৃতপক্ষে একটি সহজ ব্যাপর নয়। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ হচ্ছে 'A translator is a traitor' -- অর্থাৎ একজন অনুবাদক হচ্ছেন বিশ্বাসঘাতক। এক ভাষার বাণী ও শিল্পসৌন্দর্যকে অন্যভাষায় হুবহু রূপান্তর করা দুরূহ ও জটিল ব্যাপার। কেননা, প্রত্যেক ভাষার রয়েছে নিজস্ব রূপসৌন্দর্য, ধ্বনিমাধুর্য, বাকরীতি, প্রকাশভঙ্গি, নিজস্ব ধারা– যা অনুবাদ করা অনুবাদকের জন্য সব সময় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবু একজন সার্থক অনুবাদক তার মেধা ও যোগ্যতার মাধ্যমে অনেকটাই সফল হতে পারেন।

৩. অনুবাদের ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদের চেয়ে ভাবানুবাদ উত্তম। মূল ভাষার প্রতি যথাযথ অনুগত থেকে মূল বক্তব্যকে নিজ ভাষায় রূপান্তর করতে হবে। এজন্য মূল ভাষার শব্দভান্ডার, বাকরীতি, প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। মূল ভাষা বাগ্‌ধারা, প্রবাদ প্রবচন, বুলি সম্পর্কেও ধারণা থাকতে হবে। যেমন-Black and White সাদা কালো নয়-বরং হবে: 'লিখিতভাবে'। এছাড়া নামের ভিন্নতা সম্পর্কেও জানতে হবে। যেমন মিশর: Egypt, India : ভারত ইত্যাদি। সার্থক অনুবাদের জন্য অনুশীলনের প্রয়োজন, এর কোনো বিকল্প নাই।

৪. অনুবাদ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের কিছু বিশেষ বিবেচ্য ও করণীয় আছে। যেগুলোর দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে সেগুলো হলে :

ক. অনুবাদের শ্রেণী বিভাগ ও বৈশিষ্ট্য খ. ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ গ. সমস্যা ও অনুসরণীয় কৌশল ঘ. ভাষার অভ্যন্তরীণ দিক ঙ. অনুবাদ শিক্ষদান। এর মধ্যে শেষোক্তটির জন্য গল্পবলা ও শোনা, পাঠ্যপুস্তক থেকে অনুবাদ, পত্রিকা স্বয়ং-সংকলন ইত্যাদি কার্যকর কৌশল হতে পারে।

তবে বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে যে, দুই ভাষার মেজাজ ও রীতি-পদ্ধতি দুই রকম; তার সঙ্গে প্রকাশভঙ্গি ও সাংস্কৃতিক-সামাজি-ভৌগোলিক পার্থক্যও থাকে। তাই প্রথমে প্রয়োজন দুটি ভাষারই একটা সন্তোষজনক দখল/পারদর্শিতা। এর জন্য উভয় ভাষার কঠিন শব্দের অর্থ, বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচনের বিশিষ্ট অর্থ ও তদনুরূপ বাগ্‌ধারা, সমুচ্চারিত শব্দের অর্থের পার্থক্য, টেকনিক্যাল শব্দের অর্থ / পরিভাষা, বিভিন্নার্থক শব্দের অর্থ এবং মূল বিষয়ের কঠিন অংশের শিখন ও শিক্ষাদান জরুরি।

৫. সকল ক্ষেত্রে শিক্ষককে সহায়তা করতেই হবে।

৬. সংক্ষেপে অনুবাদের রীতি-পদ্ধতি :

- মূল অংশটুকু বারবার পড়ে মূলভাব বুঝে নিতে হবে।
- যে ভাষা থেকে অনুবাদ করতে হবে সে ভাষার দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থ এবং বাক্যের গঠনশৈলী জানতে হবে।
- ভাষার নিজস্ব রীতি সৌন্দর্য রক্ষার্থে মূলের দীর্ঘ বাক্যকে ছোট ছোট বাক্যে রূপান্তর করা যাবে।
- মূল নামের উচ্চারণ যথসম্ভব ঠিক রাখতে হবে।
- পরিভাষা জানতে হবে; তবে পরিভাষা না থাকলে মূল শব্দটি বাংলা লিপিতে ব্যবহার করা যাবে।
- মূলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি অনুবাদে বজায় থাকবে। মূলে যে বাচ্য ও ক্রিয়ার কাল থাকবে অনুবাদেও সে রকম রাখতে হবে।
- বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ প্রবচনের ক্ষেত্রে অনূদিত ভাষায় প্রচলিত বাগ্‌ধারাও প্রবচন ব্যবহার করতে হবে। যেমন– To carry coal to Newcastle- তেলে মাথায় তেল দেওয়া–`Everybody's business is nobody's business'– ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

মূল্যায়নঃ

১। অনুবাদ বলতে কী বোঝায়? এর কী-কী রকম হতে পারে? বিবৃত করুন।
২। অনুবাদের সমস্যা ও প্রয়োজনীয় কৌশল কী প্রকার? এব্যাপারে করণীয় কী হতে পারে?
৩। অনুবাদ শিক্ষাদানের জন্য আপনি কী প্রকার কার্যধারা ও অনুশীলন অনুসরণ করতে চান?

সম্ভাব্য উত্তর :

পর্ব-ক :

ক. অনুবাদ শুধু লেখার ক্ষেত্রেই নয়, বলার ক্ষেত্রেও কার্যকর।
খ. সরকারি ও বেসরকারি প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, চিঠিপত্র, বিভিন্ন নির্দেশনামা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও অনুবাদ প্রয়োজনীয়।
গ. স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ যন্ত্র বা কম্পিউটারেও আধুনিককালে অনুবাদ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

পর্ব-খ :

মূলের ভাব যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তোলা সার্থক অনুবাদের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কেননা, *'মূলের মতো সৃজনধর্মী মৌলিক রচনা হিসেবে বিবেচিত হলেই অনুবাদের সার্থকতা'।*

প্রদত্ত ইংরেজি অনুচ্ছেদের অনুবাদ :

যৌবন হচ্ছে আমাদের জীবনে সর্বোৎকৃষ্ট সময়। এই ঋতুতে আমাদেরকে পরিশ্রম, সত্যবাদিতা, সদগুণ এবং সাধুতার বীজ বপন করতে হবে যাতে আমরা উন্নতি ও সুখের ফসল আহরণ করতে পারি।

পর্ব-গ :

বাংলা ও ইংরেজি বাক্‌রীতির পার্থক্য এবং সেই সাথে প্রকাশভঙ্গির ভিন্নতা এই দুই ভাষার পারস্পরিক অনুবাদের প্রধান সমস্যা বলে মনে হয়। দুটি ভাষার প্রকৃতি ও মেজাজের সঙ্গে যথাযথ পরিচিতি অর্জনে এর কার্যকর সমাধান হতে পারে।

পর্ব-ঘ :

উভয় ভাষার রচনার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করিয়ে দেওয়াই এক্ষেত্রে শিক্ষাদানের সবচেয়ে কার্যকর কৌশল। এর সঙ্গে শিক্ষকের যত্ন ও পুনঃপুনঃ অনুশীলন যথেষ্ট কার্যকর হতে পারে।

ইউনিট ৩ **অধিবেশন ৮**

ব্যাকরণ শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি এবং পদ্ধতির অনুশীলন

বঙ্গদেশে প্রায় দু'শ বছরেরও বেশি সময় ধরে রচিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলা ব্যাকরণগ্রন্থ। কিন্তু ঘুরে-ফিরে এগুলোর সবই লাতিন, ইংরেজি এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণ বিশেষ – স্বভাষা বাংলার 'আন্তরসূত্র' প্রকৃতপক্ষে উদ্ঘাটিত হয় নি। ফলে প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণ-কাঠামো হয়ে পড়েছে ইংরেজি ও সংস্কৃত ব্যাকরণ-কাঠামোর অনুসারী।

প্রকৃত অনুসন্ধানে দেখা যাবে যে, বাংলা সংস্কৃতের দ্বারা প্রভাবিত বটে– সংস্কৃতের বেশকিছু উপাদান, নিয়ম-নীতি, ব্যাকরণ-সূত্র এবং লিপি-পদ্ধতির অনুসরণ করে বাংলা ভাষা। কিন্তু বাংলার রয়েছে নিজস্বতা– তাই বাংলা ব্যাকরণও সম্পূর্ণ পৃথক কিছু। প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ সম্ভবত এখনো রচনার অপেক্ষায় আছে।

প্রথাগত ব্যাকরণ-প্রণেতাগণ মূলত রচনা করেছেন শুদ্ধ শব্দগঠন ও প্রয়োগের অনুশাসন। প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণকে তাই বলা হয়েছে 'শব্দের ব্যাকরণ'– যাতে গুরুত্ব পায় শব্দগঠনের বিধিবিধান (ড. হুমায়ূন আজাদ)। অবশ্যম্ভাবী রূপেই বাংলা ব্যাকরণ হয়ে পড়েছে *''আনুশাসনিক''* যা আধুনিক ভাষা-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে স্বায়ত্তধর্মী ভাষারূপ শৃঙ্খলা উপস্থাপনা এবং ভাষার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ব্যর্থ হয়। কেননা, *নিয়ম-নীতির বেড়াজালে বাংলা ব্যাকরণ আবদ্ধ*। তাই শিক্ষার্থীর কাছে স্বাভাবিকভাবেই তা ভীতিকর। আবার, শ্রেণীকক্ষে গতানুগতিক পাঠদান রীতি এবিষয়টিকে শিক্ষার্থীদের কাছে কঠিন করে তোলে। কিন্তু শিক্ষণে একটু যত্নবান হলেই এই ভীতি দূর করে একে আকর্ষণীয় করা যেতে পারে। তাই ব্যাকরণ পাঠদান পদ্ধতিকে প্রাঞ্জল ও সাবলীল করে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করা একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

ব্যাকরণ পাঠদানকে মনোবিজ্ঞানসম্মত ও গতিশীলত করার জন্য ব্যাকরণ শিক্ষককেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ব্যাকরণ সম্পর্কে শিক্ষকের স্বচ্ছ ধারণা, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ এবং শিক্ষকের প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় উপস্থাপন ব্যাকরণকে একটি নীরস বিষয় থেকে সরস বিষয়ে পরিণত করতে পারে।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- ব্যাকরণ শিক্ষাদান পদ্ধতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শিক্ষাদান কৌশল অনুশীলন করাতে পারবেন।

পর্বসমূহ
পর্ব-ক : প্রচলিত পদ্ধতি এবং উপযোগিতা

ক. পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক পদ্ধতি – এদেশে শ্রেণীর পাঠ্যসূচীর ক্রমানুসারে রচিত ব্যাকরণে প্রায় সকল বিষয়ই থাকে। শিক্ষার্থীরা সাধারণত শিক্ষকের নির্দেশে অধ্যয়ন করে। সূত্রভিত্তিক *অবরোহী পদ্ধতিতে* লিখিত বলে শিক্ষকও সেভাবেই পাঠদান করেন। শিক্ষার্থীরা মুখস্থবিদ্যার উপর জোর দেয়। ফলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না এবং সারাজীবনই তা নীরস ও কঠিন থেকে যায়।

খ. ভাষা ভিত্তিক পদ্ধতি – এতে ব্যাকরণ বইয়ের অনুসরণ না করে শ্রেণীকক্ষে নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন বিষয় (গদ্য ও পদ্য) আলোচনায় প্রশ্নোত্তরে বিষয়বস্তুর সমাধান ও অবগতি উপস্থাপন করানো হয়। ফলে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিধি বেড়ে যায়। প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় সময় লাগে, তবে এটি একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরের বইগুলোতে ব্যাকরণের পাশাপাশি ভাষাভিত্তিক পদ্ধতি দেখা যায়।

গ. প্রসঙ্গক্রমিক পদ্ধতি – ব্যাকরণের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে পদ্ধতিতে সে প্রসঙ্গের অবতারণা করে পাঠ উপস্থাপনা করা হয়। উদ্দেশ্য হলো শ্রেণীর আলোচনা থেকে সুনির্দিষ্ট প্রসঙ্গ নির্বাচন করে ব্যাকরণের রীতি-পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ দেখানো। এই পদ্ধতিতে ব্যাকরণ পাঠ শিক্ষার্থীদের কাছে সরস ও আকর্ষণীয় মনে হলেও অনেক ক্ষেত্রে ব্যাকরণের জটিল অংশগুলোর আলোচনা সম্ভব হয় না, সব সময় বিষয়ানুগ প্রসঙ্গ সৃষ্টি করা শিক্ষকদের জন্যও সম্ভব হয় না।

ঘ. অবরোহী পদ্ধতি – মূলত কোনো বিবৃতি থেকে সেটির মূল বক্তব্যে পৌঁছার জন্য গৃহীত প্রক্রিয়াকে অবরোহী পদ্ধতি নামে গণ্য করা হয়েছে (স্মরণ করুন : ইউনিট ২ অধিবেশন ১০)। এই পদ্ধতিতে--

'সূত্র থেকে উদাহরণে' যাওয়া যায় বলে ব্যাকরণের কোনো সূত্রকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরলে তারা তা আয়ত্ত করে; তারপর সেটিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদাহরণ ও দৃষ্টান্তের মধ্যে প্রয়োগ করে তার নির্ভুলতা নির্ণয় করতে পারে। সূত্র -: অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয় মিলে আ-কার হয়, আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। সূত্রের প্রয়োগ : নীল(অ) + আকাশ // অ+আ=আ// নীলাকাশ।

স্বীকৃত সিদ্ধান্ত থেকে বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো, তথা সাধারণ সত্য থেকে বিশেষ সত্যে উপনীত হওয়ার এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা প্রথমে ব্যাকরণের বিভিন্ন বিষয়ের সূত্রগুলো আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে এবং পরে বিভিন্ন উদাহরণের মধ্যে সূত্রগুলো প্রয়োগ করে শুদ্ধতা যাচাই করে।

এতে শিক্ষার্থীদের কোনো সক্রিয় ভূমিকা থাকে না – নিজস্ব বুদ্ধি, যুক্তি ও চিন্তার প্রয়োগের কোনো অবকাশ থাকে না। তাই মনের দিক থেকে তারা নিষ্ক্রিয় হয় এবং পাঠ গ্রহণে আকর্ষণ বোধ করে না। এভাবে এটি একটি ত্রুটিপূর্ণ ও অমনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত।

অবশ্য, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির গুরুত্ব আছে। যেমন– ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধিতে এটি খুবই সহায়ক । তাই বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যাকরণ পঠন-পাঠনে অবরোহী পদ্ধতি সহায়ক বলে মনে করা হয়।

ঙ. আরোহী পদ্ধতি – আগেই ব্যক্ত হয়েছে যে, এটি অবরোহী পদ্ধতির বিপরীত। *এটির মূল কথা হলো জানা থেকে অজানা, মূর্ত থেকে বিমূর্ত, সহজ থেকে কঠিন, উদাহরণ থেকে সূত্র, বিশেষ থেকে সাধারণ মতে উপনীত হওয়া। এতে উদাহরণ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সূত্র বা সংজ্ঞা গঠন করতে হয়। এই পদ্ধতিতে একটি প্রমাণিত সূত্রকে গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিকভাবে গাণিতিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও বাংলা ব্যাকরণ পাঠদানেও এই পদ্ধতি ফলপ্রসূ হতে পারে।*

উদাহরণ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সূত্র বা সংজ্ঞা গঠন করতে হয় আরোহী পদ্ধতিতে <'উদাহরণ থেকে সূত্র'>। কতগুলো উদাহরণ ভালোভাবে পরীক্ষা করে সেগুলো থেকে যুক্তির সাহায্যে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেলে বা সূত্র গঠন করা গেলে আরোহী পদ্ধতি কার্যকর হয়।

ব্যাকরণ পাঠে এতে শিক্ষার্থীদের কাছে কতগুলো উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়। তারা বিচার বুদ্ধির মাধ্যমে উদাহরণগুলোকে বিশ্লেষণ করে একটি নির্দিষ্ট সূত্রে উপনীত হয়। পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সূত্র বা সংজ্ঞা গঠন করে সেই সূত্রকে আবার উদাহরণের সাহায্যে প্রয়োগ করে এর নির্ভুলতা যাচাই করে দেখে। এভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্বীয় অভিজ্ঞতায় সূত্র গঠন এবং সূত্র প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে এবং ভাষা প্রয়োগে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে।

পরিচিত পরিবেশ থেকে উদাহরণ বাছাই করে পাঠে অগ্রসর হলে ব্যাকরণপাঠ সহজ, সরল, সরস, সার্থক ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন নিষ্ক্রিয় শ্রোতা

হয়ে বসে থাকে না, তেমনি বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে একটি নতুন তত্ত্ব ও তথ্য উদ্ঘাটনের আনন্দ লাভ করতে পারে।

আরোহী পদ্ধতির একমাত্র অসুবিধা হলো এতে সময় বেশি লাগে। প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠদান এগিয়ে চলে।

চ. আরোহী-অবরোহী পদ্ধতি – এই মিশ্র পদ্ধতিতে উপরের দুই পদ্ধতিই একটি অপরটির পরিপূরক হিসেবে অনুসৃত। তাতে, প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে কিছু উদাহরণ উত্থাপন করা হয়, উল্লেখিত উদাহরণগুলো পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীগণ যুক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে মূল ও সংজ্ঞা আবিষ্কারে মনোনিবেশ করে। সূত্র গঠন শেষে অবরোহী পদ্ধতিতে সূত্রের প্রয়োগ সম্পর্কিত অনুশীলন চলে।

এই পর্যায়ে বর্তমানে কোন পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শিক্ষাদানে সবচাইতে উপযোগী ও সহায়ক বলে আপনার কাছে মনে হয় ?

পর্ব-খ : ব্যাকরণ শিক্ষাদান কৌশল

বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষাদান বা পাঠদানের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন অংশের একটি সাধারণ পর্যায়ক্রম রয়েছে।

পর্যায়ক্রমটি নিম্নরূপ-

১) উদাহরণ উপস্থাপন
২) উদাহরণ বিশ্লেষণ
৩) সূত্রগঠন
৪) শিক্ষার্থীদের অনুশীলন
৫) শিক্ষকের ফলাবর্তন

পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক তাঁর বিষয়বস্তুর প্রকৃতি বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন কলাকৌশল নির্বাচন করতে পারেন। তবে কলাকৌশল তিনি যা-ই নির্বাচন করুন না কেন, খেয়াল রাখতে হবে যেন ঐ কলাকৌশলের মধ্য দিয়ে উপস্থাপনের প্রতিটি শীর্ষে উপরে-উল্লিখিত পর্যায়ক্রম রক্ষিত হয়।

নিচের কতিপয় নমুনা/উদাহরণ খেয়াল রাখা যেতে পারে :

শীর্ষ-ক : স্বরসন্ধি

১. নিচের প্রতিটি ঘরে স্বরসন্ধির নিয়ম অনুসারে কয়েকটি নিয়মের তিনটি করে উদাহরণ দেওয়া আছে। প্রতিটি ঘরের পাশে প্রযোজ্য নিয়মগুলো উল্লেখ করতে হবে।

অপর+অপর =অপরাপর যথা+অর্থ =যথার্থ হিম+আলয় =হিমালয়	নিয়ম:
যথা+ইষ্ট =যথেষ্ট শুভ+ইচ্ছা =শুভেচ্ছা পরম+ঈশ =পরমেশ	নিয়ম:
জন+এক =জনৈক মত+ঐক্য =মতৈক্য মহা+ঐশর্য =মহৈশ্বর্য	নিয়ম:

২. নিচে স্বরসন্ধির কয়েকটি নিয়ম প্রযোজ্য এরূপ ১২টি উদাহরণ দেওয়া আছে। নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী এগুলো পৃথকভাবে সাজিয়ে লিখে নিচে নিয়মগুলো উল্লেখ করতে হবে।

পদ+অঙ্ক	= পদাঙ্ক		পর+উপকার	= পরোপকার
স্ব+ইচ্ছা	= স্বেচ্ছা		হিম+আলয়	= হিমালয়
রমা+ঈশ	= রমেশ		চল+ ঊর্মি	= চলোর্মি
মহা+অর্ঘ	= মহার্ঘ		নর+ঈশ	= নরেশ
যথা+উচিত	= যথাচিত		বিদ্যা+আলয়	= বিদ্যালয়
মহা+ঊর্মি	= মহোর্মি		যথা+ইষ্ট	= যথেষ্ট

১ ২ ৩

নিয়ম-১:				
নিয়ম-২:				
নিয়ম-৩:				

শীর্ষ-খ: স্বরসন্ধি সাধনের নিয়ম

কাজের নাম	**শিক্ষকের করণীয়**	**শিক্ষার্থীর করণীয়**	**সময়**
১) উদাহরণ উপস্থাপন	শীর্ষের নাম সংশ্লিষ্ট কতিপয় উদাহরণ নিজে উল্লেখ করা / শিক্ষার্থীদের উল্লেখ করতে বলা ও বোর্ডে লেখা।	শীর্ষ সংশ্লিষ্ট উদাহরণ উল্লেখ করা ও বোর্ডে লিখিত তথ্য খাতায় লেখা	২ মি.
২) উদাহরণ বিশ্লেষণ	উপস্থাপিত উদাহরণগুলোর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা। (বোর্ড/পোষ্টার পেপার ব্যবহার করা যেতে পারে)	বিশ্লেষিত প্রকৃতি অনুধাবন করা	৩ মি.
৩) সূত্র গঠন	সংজ্ঞা/সূত্র লিখতে বলা।	সংজ্ঞা/ সূত্র খাতায় লেখা	৪ মি.
৪) শিক্ষার্থীদের অনুশীলন	গৃহীত সিদ্ধান্ত/সূত্র/ সংজ্ঞার প্রয়োগমূলক কাজের নির্দেশ প্রদান	সিদ্ধান্ত/সূত্র/ সংজ্ঞার বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগমূলক কাজ দলীয়/ একক/ জোড়ায় করা	৮ মি.
৫) শিক্ষকের ফলাবর্তন	শিক্ষার্থীদেরকে অনুশীলনমূলক কাজের ফলাবর্তন প্রদান।	শিক্ষকের ফলাবর্তনের সাথে মিলিয়ে ত্রুটি সংশোধন করে নেওয়া।	৩.

নিম্নবর্ণিত কৌশলসমূহও তিনি শ্রেণীতে প্রয়োগ করতে পারেন।

কৌশল	শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর
১) শ্রেণীকরণ	▪ উপস্থাপন করা। ▪ জোড়ায়/ দলে চিন্তা করে এগুলোকে শ্রেণীকরণ করতে বলা।
২) পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ	▪ বিভিন্ন প্রকার সমাসের উদাহরণ আহরণের জন্য পাঠ-এর অর্পিত কার্য সম্পাদন।
৩) পোস্টার উপস্থাপন	▪ বিভিন্ন প্রকার সমাসের অর্জিত ধারণাসমূহের রূপরেখা পোস্টারে লিখে উপস্থাপন করতে বলা।
৪) তুলনামূলক বৈষম্য অনুসন্ধান	▪ দু'টি সমাসের বিভিন্ন উদাহরণ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করে তুলনা করা। ▪ জোড়ায় চিন্তা করে উদাহরণ দু'টির তুলনা করে বৈষম্যসমূহ/ পার্থক্যগুলো চিহ্নিত করতে বলা।
৫) সত্য-মিথ্যা	▪ সমাস সম্পর্কিত কিছু সংখ্যক বিবৃতি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা। ▪ বিবৃতিগুলো সত্য- না-কি মিথ্যা, মিথ্যা হলে কেন মিথ্যা তা শিক্ষার্থীদেরকে দলে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে বলা।
৬) ত্রুটি সনাক্তকরণ	▪ ভুল তথ্য সন্নিবেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে সমাস সম্পর্কিত কিছু উপস্থাপনা তুলে ধরা। ▪ শিক্ষার্থীদেরকে ত্রুটিগুলো সনাক্ত করতে এবং সংশোধনের প্রয়োজনীয় সুপারিশ করতে বলা।

এখন কি আপনি শিক্ষার্থীদের জন্য 'কর্তৃকারক ও কর্মকারক' ভিত্তিক একটি সিম্যুলেশন-কর্মপত্র তৈরি করতে পারেন?

ইউনিট ৩ **অধিবেশন ৮**

মূল শিখনীয় বিষয়
ব্যাকরণ শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি এবং পদ্ধতির অনুশীলন

ব্যাকরণ পাঠদান পদ্ধতি	
	আরোহী পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে প্রথমে উদাহরণের বিশ্লিষ্টরূপ উপস্থাপন করা হয়, পরে সামষ্টিকরূপ ব্যাখ্যা করা হয়। **অবরোহী পদ্ধতি:** এই পদ্ধতিতে প্রথমে উদাহরণের পূর্ণরূপ উপস্থাপন করা হয় এবং পরে এর বিশ্লিষ্টরূপ ব্যাখ্যা করা হয়।
	আরোহী পদ্ধতি বিষয়বস্তু সম্পর্কিত ধারণা গঠনকে সহজ ও সাবলীল করে। অংশভিত্তিক চিন্তা পরে সামষ্টিক রূপ পায়। অবরোহী পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে অবরোহী বা প্রয়োগমূলক চিন্তার সুযোগ করে দেয়। অর্থপূর্ণ শিখনের পূর্বশর্ত হচ্ছে সামগ্রিক শিখন। এই সামগ্রিক শিখন অবরোহী পদ্ধতিতে হয়ে থাকে।
	প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যাকরণ পাঠদানের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত দু'টি পদ্ধতির সুষম সমন্বয় ঘটানো আবশ্যক।
ব্যাকরণ পাঠদান কৌশল	
	বাংলা ব্যাকরণ পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের বিচার বিবেচনা ও প্রযুক্ত কৌশল শিক্ষণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। নীরস ব্যাকরণকে আকর্ষণীয় ও আগ্রহী হিসেবে শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরতে পারলে পাঠদান সফল হতে পারে। এর জন্য শিক্ষক বিষয়বস্তুর উপস্থাপন অংশের একটি সাধারণ পর্যায়ক্রম রয়েছে। পর্যায়ক্রমটি নিম্নরূপ: ১) উদাহরণ উপস্থাপন ২) উদাহরণ বিশ্লেষণ ৩) সূত্রগঠন ৪) শিক্ষার্থীদের অনুশীলন ৫) শিক্ষকের ফলাবর্তন
	পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক তার বিষয়বস্তুর প্রকৃতি বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন কলাকৌশল নির্বাচন করতে পারেন। তবে কলাকৌশল তিনি যা-ই নির্বাচন করুন না কেন, খেয়াল রাখতে হবে ঐ কলাকৌশলের মধ্য দিয়ে উপস্থাপনের প্রতিটি শীর্ষে পূর্ব-উল্লিখিত পর্যায়ক্রম যেন রক্ষিত হয় । **এসব কাজে শিক্ষক চিন্তা-ভাবনা করে অনুশীলনের কিছু মডিউল তৈরি করে নিতে পারেন।**

মূল্যায়নঃ

১। বাংলা ব্যাকরণের প্রকৃতি সংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিন।

২। ব্যাকরণ কেন শিক্ষার্থীর কাছে কঠিন বা ভীতিপ্রদ মনে হয় ? এর জন্য শিক্ষকের করণীয় কী হতে পারে ?

সম্ভাব্য উত্তর :

পর্ব-ক :

প্রদত্ত সবগুলো পদ্ধতি বিবেচনা ও পর্যালোচনা করে আরোহী পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শিক্ষাদান সবচাইতে উপযোগী, সহায়ক ও মনোবিজ্ঞান সম্মত বলে মনে হয়। তবে প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যাকরণ পাঠদানের ক্ষেত্রে উল্লিখিত দু'টি পদ্ধতির সুষম সমন্বয় ঘটানো আবশ্যক।

পর্ব-খ :

কর্মপত্রঃ কর্তৃকারক ও কর্মকারক (সিম্যুলেশন)

<table>
<tr><td></td><td>(ক) ক্রিয়াপদের সঙ্গে নিম্নরেখ পদগুলোর কর্তা/কর্ম সম্পর্ক বিবেচনায় বাক্যগুলোকে দুই কলামে সাজাও (জোড়ায়)
(১) <u>মা</u> শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। (২) নাসিমা <u>ফুল</u> তুলছে। (৩) মুষলধারে <u>বৃষ্টি</u> হচ্ছে। (৪) <u>ছেলেটিকে</u> বিছানায় শোয়াও। (৫) রাখাল <u>গরুকে</u> ঘাস খাওয়ায়। (৬) খুব এক <u>ঘুম</u> ঘুমিয়েছি। (৭) <u>বাঘে-মহিষে</u> এক ঘাটে জল খাচ্ছে। (৮) <u>দুধকে</u> আমরা দুগ্ধ বলি।</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

কর্তৃ-সম্পর্ক	কর্ম-সম্পর্ক

<table>
<tr><td></td><td>(খ) সংজ্ঞা লিখে- (একক কাজ)
কর্তৃকারক-
কর্মকারক-</td></tr>
<tr><td></td><td>(গ) এবার কর্তৃকারকের উদাহরণগুলো লিপিবদ্ধ করে বিভিন্ন প্রকার কর্তৃকারকের নামের পাশে সংশ্লিষ্ট উদাহরণ লিখ- (জোড়ায় কাজ)</td></tr>
<tr><td>মুখ্য কর্তা-</td><td></td></tr>
<tr><td>প্রযোজক কর্তা-</td><td></td></tr>
<tr><td>প্রযোজ্য কর্তা-</td><td></td></tr>
<tr><td>ব্যতিহার কর্তা-</td><td></td></tr>
</table>